# কনক দীপ

আশাপূর্ণা দেবী




রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬৫

প্রকাশনা :

সুধীর মুখার্জ্জী
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

মুদ্রণ :

রেজিনা প্রেস
১৩১, হরিশ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬

বাঁধাই :

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট,
৯৩/১এম, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা

মূল্য : [illegible] তিন টাকা

শ্রীমান শুভাশীস রায়
প্রীতিভাজনেষু

অসহ্য গুমোটটা ঝড়ের পূর্ব্বসঙ্কেত। সমস্ত দুপুরের অসহ্য গুমোটের পর ঝড় উঠলো বিকেলের দিকে। দুরন্ত দুর্দ্দাম ঝড়—যেন উন্মত্ত গরুড়ের ক্রুদ্ধ পাখার ঝাপটানি। তোলপাড় করে তুলতে চায় সমস্ত পৃথিবীটাকে।

চকিত হয়ে বিছানা থেকে উঠে বসলেন মিত্তির সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে চাকর এসে ঝটাপট বন্ধ করে দিলো জানলা দরজাগুলো। শিক্ষিত ভৃত্য, জানে ঝড়ের ধূলো ঘরে ঢুকলে তার চাকরীতে টান পড়তে পারে।

কিন্তু মিত্তির সাহেবের আজ কি হ'লো কে জানে, জানলাগুলো বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিরক্তিসূচক একটা 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করে নিজে উঠে গিয়ে দু'হাতে ধাক্কা মেরে বারান্দায় দরজাটা খুলে ফেলে বেরিয়ে এলেন।

মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো চওড়া বারান্দা, কেন কে জানে চাকর-বাকরগুলো বলে 'গাড়ী-বারান্দা'। সেখানে প্রচণ্ড শব্দের দাপাদাপি। সেখানে ধূলোর উন্মাদ লাফালাফি। অসংখ্য মুঠোয় কে যেন ধূলোপড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাগলা করে দিতে চায় মিত্তির সাহেবকে।

প্রথমটা বোধকরি ঝড়ের ঝাপটে অজ্ঞাতসারেই একবার পিছিয়ে এসেছিলেন মিত্তির সাহেব, তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালেন।

ঝড় মানেই তো ধূলোর ছুটোছুটি।

রাস্তার মাঝখানে মাঝখানে ধূমকুণ্ডলীর মতো পাক দিয়ে উঠছে ধূলোর কুণ্ডলী যে কুণ্ডলী বাতাসের তাড়নায় বোঁ বোঁ করে ছুটছে চলন্ত

রেলগাড়ীর মতো। ধূলোর শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে ছেঁড়া কাগজ, শুকনো শালপাতা।

চাকরটা ঘরের মধ্যে থেকে সবিনয়ে জানালো একবার—"বাবু ভারী ঝড় উঠেছে।"

এটা বাহুল্য বিজ্ঞপ্তি বটে, তবে কথাটার প্রকৃত অর্থ বোধ করি "বাবু, খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখবার উপযুক্ত সময় এটা নয়।"

মিত্তির সাহেব শুনতে পেলেন বলে মনে হ'লো না। চাকরটা খানিকক্ষণ হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে বাঁচাতে সরে পড়লো।

বাইরের বাতাস এসে তোলপাড় করতে লাগলো—রেশমী পর্দ্দা, শাটিনের বেড্কভার, ভেলভেটিং কার্পেট। জঞ্জালে ভরিয়ে তুলতে লাগলো আয়না-পালিশ আসবাবপত্র, সৌখিন টেবল্-ল্যাম্প, শ্বেত-পাথরের ফুলদানী, পিতলের বুদ্ধমুর্ত্তি।

শন্ শন্ করে কী একটা পাতা ঠিকরে এসে গায়ে লাগলো।

কী এ?

পাতা না? কী পাতা?

আম পাতা!

মুঠোয় চেপে ধরে পরীক্ষা করতে গেলেন মিত্তির সাহেব, গুঁড়িয়ে গেলো হাতের মধ্যে। হয়তো অজানা বুঁজে গাছের পাতা, হয়তো বা সত্যিই আমপাতা। কিন্তু শুকনো খড়খড়ে বুড়োপাতা।

কাঁচাপাতা ওড়েনা এখানে? সেই কবেকার কোন ভুলে যাওয়া দিনে যেমন উড়তো অসংখ্য কাঁচাপাতা? ছপাছপ ঝপাঝপ করে গায়ে এসে পড়া সেই পাতাগুলোকে ঝাড়তে ঝাড়তে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ফেলে যারা দেখছে তাজা পাতার সঙ্গে তাজা মটমটে কাঁচা আমগুলো কোথায় কোথায় পড়ছে, ওরা কারা?

ওই ঝড়ে লুটোপুটি খাওয়া প্রকৃতির মতোই দুর্ব্বার দুরন্ত ওই প্রাণীগুলো ? ওরা যে বাগানে লুটোপুটি করছে, কেবলমাত্র কি ওই কাঁচা আমগুলোর আশায় ? না লুটোপুটিটাই সুখ ?

কিন্তু কোথায় সেই আমবাগান ? কবেকার ছবি ওটা ?

মিত্তির সাহেবের সঙ্গে ও ছবির কোন যোগসূত্র আছে ?

ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়ছে, বাড়ছে বুক-কেমন-করা শব্দ। কোথাকার একটা ছোট্ট দোকানের শেড্‌টা বুঝি খুলে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়লো রাস্তার ওপর। ভয়ঙ্কর সেই শব্দে কানে তালা দিয়ে উঠলো।

এত ধূলোয় আর চোখ বন্ধ না করে উপায় নেই। কিন্তু বন্ধ চোখের সন্ধানী দৃষ্টি, বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে চাইছে কেন আজ ? কী সে খুঁজছে ? পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে অবস্থিত সেই আমবাগানটিকে ? যেখানে গাছপালা ফলপাতার মতোই প্রবল বর্ষণে নির্ভয়ে ভিজছে কাঁচাআম-লুব্ধ প্রাণীগুলো ?

ওরা কী মনুষ্য-শাবক ? না ওই দুরন্ত প্রকৃতিরই এক টুকরো অংশ ? কিন্তু কোথায় ছিল ওরা ? কোথায় কবে করতো এই দুরন্ত মাতামাতি ?

দেশটার নাম থাক, শুধু ছবিটাই আঁকা হোক।

সোঁদা সোঁদা গ্রাম নয়, চড়া কড়া শহর নয়, মাঝারি মফস্বল টাউন। যেখানে গ্রাম-শহর দুয়েরই আস্বাদ মেলে। যেখানে সমাজ জীবনে ধীরতা স্থিরতা আছে, ঘরে সংসারে আব্রু-সভ্যতা আছে, পুরুষের জীবনে কর্ম্মব্যস্ততা আছে, মেয়েদের জীবনে গতি আছে। তবু আমবাগানে ঝড় ওঠে।

আচ্ছা, চিরকালই কি ঝড়ের আগে পৃথিবীর মাটি থেকে এমনি উত্তাপ ওঠে ? এমনিতরো দম আটকানি গুমোট দেখা দেয় ? যেমন এই একটু আগে দেখা যাচ্ছিলো ?

বোধহয় যায়।

নইলে সেদিন কানু নামক সেই অতোবড় ছেলেটাকে যখন তার মা-পিসি দু'জনে মিলে গালমন্দ করে ঘরে আটকে রেখে পাখা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিলো, তখন ছেলেটার এমনি দম আটকানো গবমের অনুভূতি লাগছিলো কেন? কেন ইচ্ছে করছিলো দাঁড়িয়ে উঠে মাথার চাড় দিয়ে ঘরের ছাদটাকে খুলে ফেলে দিতে? কেন ইচ্ছে করছিল দু'হাত দিয়ে ঠেলে দেওয়ালগুলো সরিয়ে দিতে?

অবশেষে ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখলো আকাশ অন্ধকার!

দিন-দুপুরেই ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার ছলনা!

রাসমণির হাত থেকে পাখাটা কখন পড়ে গেছে, গলদঘর্ম রাসমণির নাক ডাকছে স্বচ্ছন্দ তালে। তার পাশে তার ভাই-বৌ কমলাও রোগা দেহটাকে একটা ভিজে দড়ির মতো এলিয়ে দিয়ে হাঁ-করে ঘুমোচ্ছে। নিশ্বাসের ওঠাপড়ায় তার পাঁজরের খোঁচাখোঁচা হাড়গুলোরও ওঠাপড়া কাপড়ের আচ্ছাদন থেকেও বোঝা যাচ্ছে।

ওদের মাঝখান থেকে উঠে সরে পড়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েই কোঁচার কাপড়টা খুলে মাথার ওপর 'পাল তুলে' দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকে ছেলেটা। ছুটতে ছুটতে একটা পুবনো একতলা বাড়ীর কাছ বরাবর এসেই কি ভেবে বাড়ীর সদরে না ঢুকে পাশ দিয়ে এগিয়ে 'ওঁচলাগাদা' ডিঙিয়ে ভিতর দালানের জানলায় গিয়ে ডাক দেয়, "ফুলি, এই ফুলি!"

বলাবাহুল্য স্বর উচ্চগ্রামে নয়, তবু ঠিক জায়গায় পৌঁছতে দেরী হয় না। দালানের জানলার একটা কপাট খুলে গেলো, এবং একটি ভীত সন্ত্রস্ত মুখ যেন আলোর মতো ফুটে উঠলো!

দু'জনেরই কণ্ঠস্বর খাদে।

"কে কানুদা?"

"হ্যাঁ, বেবিয়ে আয় চুপি চুপি।"

"কানুদা!"

"কি হলো! চোখ গুলিগুলি করছিস যে!"

"আবার তুমি আজ বেরিয়েছো কানুদা? দেখছো না আকাশের অবস্থা? বাড়ী যাও শীগ্‌গির।"

কানু মুখ ভেঙ্‌চে বলে ওঠে—"আহা! কী কথাই বললেন! 'বাড়ী যাও শীগগির!' গাছে আজ আর একটাও আম থাকবে ভেবেছিস? বেরিয়ে আয় চটপট।"

জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে ফুলি।

আকাশের ঈশান কোণ জুড়ে অন্ধকারের কী বিরাট সমারোহ! মেঘের মাথায় মাথায় রূপালি জরিফিতের ঝলকানি! আমবাগানের চেহারাটা কল্পনা করে ফুলির ছোট্ট বুকটায় দুরন্ত লোভ স্পন্দিত হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই, তবু ফুলি ভারীক্কিচালে বলে ওঠে, "আচ্ছা বেহায়া তো তুমি কানুদা! তোমার পিঠের দাগ যে এখনো মিলোয় নি। জ্যেঠামশাইয়ের খড়মজোড়া হারিয়ে গেছে বুঝি?"

এতো অপমান অবশ্য নীরবে সহ্য করা কানুর পক্ষে সম্ভব নয়, সে ফুলির গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, "হয়েছে, হয়েছে, খুব পাকামো হয়েছে! যাবি না তো যাবি না, বয়ে গেলো! কে তোর জন্যে মরছে!"

ঝড় ওঠে আকাশে, ঢেউ ওঠে গঙ্গায়।

এক গালের চড় খাওয়া লাল ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে!

বালিকার চোখে তরুণীর তীব্রতা!

"যাবো নাই তো—! আমি কি তোমার মতো গুরুজনের অবাধ্য?"

"গুরুজন!"

"পাল তোলার" জন্যে খোলা কোঁচাটা এতোক্ষণ কাঁধে জড়ো করা পড়েছিলো, সেটাকে টেনে নিয়ে জোরেজোরে কোমরে জড়াতে জড়াতে কানু ফের মুখ ভেঙচে বলে, "গুরুজনের বাধ্য হয়ে তো সগগের

সিঁড়ি হবে! গুরুজনের নাম করিসনে আমার কাছে। ছোটদের মারতে বকতেই ওরা জন্মেছে।"

কানুর এহেন মন্তব্যে ফুলি হেসে ফেলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ চোখ-ধাঁধানো একটা আগুনের ফিতে আকাশের গায়ে যেন সাপের মতো ফুঁসে দুলে উঠলো। সঙ্গেসঙ্গে প্রলয়ঙ্কর একটা শব্দ!

এ শব্দ চেনেনা এমন কে আছে?

তবে মনে হলো বড্ডো কাছাকাছিই কোথাও পড়েছে বাজটা।

বজ্র আর বিদ্যুৎ!

মুহূর্তের জন্য দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

এর পরই বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো।

বিষ্টি দেখেই কানু চেঁচিয়ে ওঠে —"এই সেরেছে! বিষ্টি এসে গেলো! ফুলি আয় না! না হয় বাড়ীতে একটু মারবে।" বলেই ফুলির কাঁচের চুড়ি পরা গোলগাল একখানা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারে।

তথাপি ফুলি আত্মরক্ষা করে "না ভাই না!"

"যাবি না তাহলে?"

"রাগ করিসনে কানুদা—" ফুলির মুখের রেখায় রেখায় ভয়ের স্বাক্ষর। গুরুজনের অবাধ্য হ'বার ভয়, কাল-বৈশাখীর মেঘপ্রমত্ত আকাশের ভয়, আর নাম-না-জানা একটা দুর্ব্বার আকর্ষণের ভয়!

"বেশ যাসনে! ভীতু ব্যাঙ্ কোথাকার! ব্যাঙ্ ব্যাঙ্ কুয়োর ব্যাঙ্!"

উন্মত্তবেগে ছুটে যায় কানু আমবাগানের দিকে। ফুলি বৃষ্টি থেকে সরে এসে জানলার দিকে দাঁড়ায়! হয়তো এই নিদারুণ অপমানে ওই বৃষ্টির মতোই বড়ো বড়ো কয়েকটি ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে তার চোখের কোল বেয়ে।

ছেলেবেলায় ভীরুতার অপবাদ সব থেকে মর্ম্মান্তিক। আরো মর্ম্মান্তিক, সে ভীরুতা যদি নিরুপায়তা থেকে সৃষ্ট হয়।

শহুরে ছেলেমেয়েদের চিত্ত-জগৎটা যেন শূন্যোদ্যান! ওর মূল বনেদে না আছে গভীর আনন্দের মাটি, আর না আছে নিবিড় রসানুভূতির শিকড়।

শহুরে ছেলেমেয়েদের বাল্য-কৈশোর যেন মেটে রঙের কালিতে লেখা একটা দিনলিপির খাতামাত্র।

রুলটানা খাতায় একটানা লেখা!

পরবর্ত্তীকালে সে খাতা কোনদিন উল্টে দেখতে গেলে কোথাও চোখ আটকে যাবে না। শহুরে ছেলেমেয়েদের 'ছেলেবেলা' বহু বিচিত্র অনেকগুলি ছবির সমষ্টি নয়, ঝাপসা ঝাপসা অনেকগুলো ঘটনার সমষ্টিমাত্র।

নিজের ছেলে 'টুটুল' 'টোকনে'র জন্য করুণা অনুভব করেন মিত্তির সাহেব। যে ছেলেমেয়েরা শেষরাত্রে উঠে পরের বাগানের ফুল চুরির, আর রোদে খাঁ খাঁ দুপুরে পরের পুকুরের মাছ চুরির রোমাঞ্চ জানলো না, তাদের জন্যে করুণা হবে না?

যারা কালবোশেখীর ঝড়ে আম কুড়োয়নি, যারা খালি পায়ে এক হাঁটু ধূলো মেখে তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে 'মেলার বাজারে' যাত্রা দেখতে যায়নি, যারা সেই মেলার বাজারের বাদাম তেলেভাজা পাঁপর আর সাত দিনের বাসি ঝালমুড়ি খেয়ে যাত্রার আসরের এক কোণে পড়ে ঘুমিয়ে জ্বর-জ্বর-গা আর লাল-লাল চোখ নিয়ে সকালবেলা বাড়ী ফিরে বাপ কাকার কাছে পিটুনী খায়নি, যারা গাছে চড়েনি, জলে ঝাঁপাই ঝোড়েনি, পাখীর বাসা থেকে ছানা পেড়ে আনেনি, তাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে আছে কি?

কিছু না।

শুধু একমুঠো শূন্যতা!

যাত্রা!

যাত্রার কথা মনে পড়তেই—মনে পড়ে যায় কি যেন এক বিখ্যাত অপেরা পার্টির কি যেন 'পালা'র ভীমসেনকে। 'পালা'র নাম মনে নেই, ভীমসেনকে মনে আছে।

ইয়া গোঁফের জোড়া, ইয়া ভুরুর জোড়া, ইয়া ভুঁড়িদার সেই ভীমসেনকে ভোলার কথাও নয়। ভোলবার কথা নয় সাংঘাতিক সেই দৃশ্যটাও।

মিত্তির সাহেবের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস।

বীর বিক্রমে নাচতে নাচতে কোমরবন্ধ খুলে পড়েছিলো ভীমসেনের। খসে পড়েছিলো ভেলভেটের প্যান্ট। হতভাগ্য ভীম বিপদের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও টের পায়নি। যখন পেলো তখন ধুপ্ করে বসে পড়লো বটে, কিন্তু তখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

দর্শকমহলে সে কী হাসির ধুম!

আধঘন্টা ধরে চলতে লাগলো সেই হাসির দমক। পালা আর জমলোই না তারপর।

সেই হাসির রেশ নিয়ে বাড়ী ফিরে, সে কী বেধড়ক প্রহার জুটেছিল বেচারা কানু বলে ছেলেটার ভাগ্যে! মেরেছিলো কে? না সেই কাকাটি, যিনি নিজে তখুনি যাত্রার আসর থেকে ফিরেছেন।

সাধে কি আর কানু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে 'গুরুজনগুলো' শুধু ছোটদের মারতে বকতেই জন্মেছে!

কানুর দেখা সেই দেশটার অতীতের পাতাটা একবার খুলে দেখলে কেমন হয়? কি যেন নাম? 'রায়গঞ্জ'? 'পাট নগর'? 'সদর হাট'? হবে যাহোক একটা। সে নামে আর আজ কার কি দরকার?

না কড়া পীচঢালা শহর, না ভিজেভিজে সোঁদা মাটির গ্রাম। আধা-শহর-আধা-গ্রাম মফস্বল টাউন। পুরুষরা বেলা দশটার মধ্যে ভাত খেয়ে ফর্সা ধুতিকামিজ পরে কোর্টে-কাছারিতে, স্কুলে, ইউনিয়ান বোর্ডে, কি মিউনিসিপাল অফিসে ছোটে, মেয়েরা তারপর ক্ষার কাচে, বড়ি দেয়, পাড়া বেড়ায়, বেলা তিনটেয় ভাত খেয়ে গড়াগড়ি পাড়ে।

তবে ব্যতিক্রম কি আর নেই?

ব্যতিক্রম কান্নুদের বাড়ী, ব্যতিক্রম ফুলিদের বাড়ী। কান্নুর বাপ-কাকার গুড়ের ব্যবসা, তাদের নাওয়া খাওয়ার ঠিক নেই। আর ফুলির দাদু হাইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার হলেও, এবং তাঁর নাওয়া খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকলেও, ওদের সংসারের কিছু ঠিকঠাক নেই।

মাষ্টারমশাইয়ের গৃহিণী নেই, মারা গেছেন অনেক দিন। একটা বিধবা মেয়ে ছিলো, সেটিও গেছে। তারই মেয়ে ফুলি। তাকে সদ্যোজাত শিশু থেকে মানুষ করছেন মাষ্টার শিবনাথ চাটুয্যে।

কিন্তু তা'হলে ফুলিদের সংসার পরিচালনা করে কে?

সেও একটি ব্যতিক্রম।

দু'চারটি করে গরীব ছাত্র পোষা শিবনাথ মাষ্টারের বাতিক। জীবনে সাধ ছিলো ভারতবর্ষের সনাতন ভাবধারার আদর্শে একটি 'বিদ্যার্থী আশ্রম' স্থাপন করবেন। আশ্রমের নৈতিক শিক্ষা, আর আধুনিক উচ্চশিক্ষা, এই দুই শিক্ষার সমন্বয়ে বলিষ্ঠ করে তুলবেন সেই 'বিদ্যার্থী' বালকদের চরিত্র, স্বাস্থ্য, স্বভাব। বিনা দক্ষিণায় তাদের তৈরী করে তুলবার বিনিময়ে থাকবে একটি মাত্র সর্ত—তারা যেন প্রত্যেকে এই অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেশের অন্ততঃ পাঁচটি লোকেরও নিরক্ষরতা দূর করতে যত্নবান হয়।

দীপশিখা থেকে দীপশিখা, জ্ঞানদীপ থেকে জ্ঞানদীপ!

শিবনাথ মাষ্টার বলেন "প্রত্যেকের মধ্যেই প্রদীপ আছে, আছে তেল সলতে, শুধু একটু জ্বালিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। দেওয়ালীর আলোর মতো একের থেকে হাজার প্রাণের আলো উঠবে জ্বলে। সেই আলোর আগুনে ভস্মীভূত হবে, দেশের অজ্ঞানতা, নীচতা, সংকীর্ণতা। ভস্মীভূত হবে লোভ আর পাপ, ঈর্ষা আর স্বার্থ।"

আদর্শবাদী ভাবুক মাষ্টার এমন অনেক কথাই বলতেন, কিন্তু জীবনে তিনি তাঁর ইচ্ছার অনুরূপ আশ্রম গড়ে তুলতে পারেননি। মফস্বল স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, সাধ থাকলেও সাধ্য কোথায়?

জীবনের আরম্ভ থেকেই শিবনাথ শিক্ষাব্রতী। কতো ছেলেকে মানুষ করে চলেছেন। স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে মধ্যে সবাইকে বলেছেন নিজের এই আদর্শের কথা। বলেছেন "তোরা মানুষ হবি, কৃতী হবি, অবশ্যই অনেকে ধনী হবি। তখন মনে রাখবি তো আমার কথা? জানিস তো, দশের তিল একের তাল! যারা যারা কৃতী হবি, ধনী হবি, আমার আশ্রমের জন্যে কিছু কিছু যদি দিস, তা'তেই আমার স্বপ্ন সফল হবে।"

সব ছেলে বলেছিলো "নিশ্চয় দেবো স্যার, নিশ্চয় দেবো।"

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর সে স্বপ্ন সফল হয়নি শিবনাথ মাষ্টারের। তার সেই প্রথম জীবন থেকে যাদের মানুষ করে এলেন, তারা 'মানুষ' আর হলো কই? তারা অনেকেই আজ সত্যই কৃতী, ধনী, বিখ্যাত। কিন্তু ছেলেবেলার সে প্রতিশ্রুতি আজ আর কারো মনে নেই। আর যদিও বা স্মৃতির রোমন্থনে কোন দিন মনে পড়ে যায়, হয়তো হাস্যকর ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না সে প্রতিশ্রুতিকে।

তাই নিজের সাধ্যাতীত সাধ্যে কয়েকটি দুঃস্থ ছেলেকে বাড়ীতে জায়গা দিয়ে রাখেন মাষ্টার, বিনা মাইনেয় স্কুলে পড়তে দেন। স্কুলের গণ্ডী পার হলেই তাদের ছেড়ে দিতে হয় বাধ্য হয়ে।

একদল যায় আর একদল আসে।

তারাই মাষ্টারমশাইয়ের গৃহিণীহীন গৃহে ভাত রাঁধে, জল তোলে, বাটনা বাটে, কুটনো কোটে।

ভাগ্যের কাছে সব রকমেই পরাজয় মাষ্টারের। সাধ ছিলো এই সব ছেলেদের মায়ের মত হয়ে সেবা যত্ন করবেন তাদের 'গুরুমা'। কিন্তু তিনিও রইলেন না। বিধবা মেয়েটা পর্য্যন্ত, যে মেয়ে বাপের আদর্শে জীবনকে গড়তে চেয়েছিলো, যে এই সব দুঃখী ছেলেদের মায়ের মতো হতে পারতো, সেও গেলো।

শুধু মরুভূমিতে ওয়েশিস্ আছে ফুলি।

তা প্রথম দিকে ফুলিও প্রায় মানুষ হয়েছে, ওই ছেলেদেরই হাতে। এখন অবিশ্যি ফুলি বারো তেরো বছরের হয়ে উঠেছে। আর হয়ে উঠেছে রীতিমত একটি গিন্নী।

আগের দলেরা ফুলিকে মানুষ করে গেছে, বর্ত্তমানের দলকে ফুলিই মানুষ করছে।

রাসমণি চেঁচাচ্ছিলো।

চেঁচাচ্ছিলো কানুর উদ্দেশে।

"হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া ছেলে এখনো এলো না গো! এতো বড়ো ঝড় জল হয়ে গেলো, ভয় ডর নেই প্রাণে? আচ্ছা একবার তো ফিরতে হবে বাড়ীতে, তখন কি করি দেখাচ্ছি। তাকে যদি জ্যান্ত ধরে 'চণ্ডীতলা'য় দিয়ে না আসি তো আমি—" অকথ্য একটা দিব্যি গালে রাসমণি।

বলাবাহুল্য 'চণ্ডীতলা' হচ্ছে এ অঞ্চলের শ্মশান।

কানুর মা কমলা শুনতে পেয়ে বিরক্তস্বরে বলে "ভর সন্ধ্যাবেলা ওসব কি ছাই ভস্ম গাল পাড়ছো ঠাকুরঝি?"

প্রতিবাদ শুনেই ঠাকুরঝি রাসমণি আক্রমণের টার্গেট বদলায়। মুখ বিকৃত করে বলে "এই যে এলেন রাধের রাধা! ছেলে শাসন করতে জানেন না, জানেন খালি আদর দিতে, আর গেলাতে। আমি মা হলে অমন ছেলেকে জ্যান্ত গোর দিতাম।"

"কি বললে?" তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে কমলা।

"ঠিক কথাই বলেছি।" রাসমণিও সমান তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দেয়।

"তা'বলবে বৈকি—" বলে কমলা আঁচলটা হঠাৎ কোমরে জড়াতে থাকে।

কমলা কথা কম কয়, কিন্তু দৈবাৎ যখন মুখ খোলে তখন তার কথার ধারটা রাসমণির প্রাণে ছুরির মতোই কাজ করে।

কোঁচড়ে আমের বস্তা নিয়ে খিড়কির দরজায় উঁকি মারছিলো কানু। ভেবেছিলো চুপি চুপি ঢুকে পড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় আমগুলো ঢেলে দিয়ে দোতলায় পালাবে। কিন্তু উঁকি মেরে দেখলো উঠোনের অবস্থা ভয়াবহ।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বড় বড় এক একটা গাছ বসানো উঠানটা যেন জমাট অন্ধকারের পাহাড় একটা, তার মাঝখানে তুলসীমঞ্চের কুলুঙ্গীতে মাটির প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটা কেঁপে কেঁপে একটা আলো আঁধারের সৃষ্টি করছে।

এ যেন আলো নয়, আলোর দৈন্যের চরম প্রকাশ। আবার দালানে বসানো হ্যারিকেন লণ্ঠনটাও তদ্রূপ। রাসমণির কড়া হুকুমে 'চোখের কাজে'র দরকার ছাড়া, সর্ব্বত্র সব সময় বাড়ীর হ্যারিকেন লণ্ঠনের শিখাগুলো ক্ষীণ করে রেখে দেওয়া হয়।

প্রায় নিষ্প্রদীপের মোহড়া!

ঝগড়া কোঁদলটা চোখের কাজ নয়, কাজেই দালানের ওপর বসানো হ্যারিকেনটাও আলোর চাইতে অন্ধকার সৃষ্টি করছে বেশী।

আর এই অন্ধকারের মধ্যে প্রেতিনীর মতো দুটো মানুষ চেঁচাচ্ছে।

মুখটা একটু বাড়িয়েই কানু আবার টেনে নিলো, শুনতে পেলো কমলা বলছে "তুমি মা হলে ছেলেকে জ্যান্ত গোর দিতে তা আমিও জানি ঠাকুরঝি! পিসি হয়েই যখন এই! তা তুমি যাব মা হবে এমন দুর্ভাগাকে গড়তে ভগবানেরও বোধ হয় প্রাণ কেঁদেছে, তাই গড়েনি।"

বন্ধ্যা রাসমণি এই কটাক্ষে ধেই ধেই করে নেচে ওঠে "কি বললি? কি বললি নতুনবৌ? এতোবড়ো আসপদ্দা তোর? কেনোর মতোন ছেলে আমার হলে জ্যান্ত গোর দেওয়া কেন, জ্যান্ত দাঁড় করিয়ে করাত দিয়ে চিরতাম। বুঝলি? গাল দেবো না! একশোবার দেবো, হাজার বার দেবো। কেউ এসে খবর দিয়ে যায়, কেনো বাজ পড়ে মরেছে, তো আমি এখুনি স'পাঁচ আনার হরিরলুঠ দেবো।"

এমনিই মুখ রাসমণির।

আবার ওই কানুরই দু'দিন অসুখ করলে রাসমণি তিনমাইল রাস্তা হেঁটে চণ্ডীতলায় 'হত্যে' দিতে যায়, চণ্ডীতলার 'পাগলাবাবার' কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে। বংশাবলীর ধারানুক্রমিক অশিক্ষা আর কুশিক্ষাই তাকে এমনি রূঢ় আর অমার্জিত করে রেখেছে।

কিন্তু সে সব কথা বোঝবার ক্ষমতা বালকের থাকে না।

মা পিসির ব্যবহারে কানু তিক্ত উত্যক্ত। তার ওপর আছেন বদমেজাজী দুর্দ্দান্ত বাপ, আর ধূর্ত্ত ফিচেল এক কাকা। কানুকে শাসন করাই যেন কানুর কাকার জীবনের পরম আনন্দ, চরম সার্থকতা।

কে বলবে কেন ? হয়তো এর জন্যে কেবলমাত্র তার প্রকৃতিই দায়ী।

রাসমণির আস্ফালনে কমলা আবার বলে ওঠে "যাকে বলো 'মর্ মর্', সে পায় দেবীর বর। তোমার গালাগালে আমার ছেলের কিছু হবেনা, বুঝলে ঠাকুরঝি ? শুধু তোমার মুখেই পোকা পড়বে।"

আমের ভারে কোঁচার কাপড় ফাঁসছে টের পাচ্ছে কানু। এখনো এইবেলা এ গুলোকে গুটিয়ে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে এনে ফেলতে না পারলে নির্ঘাৎ ছিঁড়ে ছড়িয়ে সব বরবাদ যাবে। আনাচে কানাচে নোঙরা জায়গায় পড়লে তো আর রাসমণি নেবে না। আর রাসমণিই যদি না নিলো, কাঁচা আমগুলো নিয়ে হবে কি ?

বাড়ীর ভয়াবহ শাসন, আর প্রকৃতির ভয়াবহ আক্রমণ, এই দুটো স্বীকার করে নিয়ে, এককথায় প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে, এই আমের ভরা ভারী করবার নেশা কেন এদের ?

অবাধ্য দুঃশাসন ছেলেগুলো নিজেরাই কি জানে কেন ? আম কুড়োনো শুধুই কি স্ফূর্ত্তির উদ্দণ্ড প্রকাশের সুযোগ ? ঠিক তাও নয়। বোধকরি ওদের দশাও রাসমণির মতোই। যেন 'মর্' বলে গাল দিয়ে তারই কল্যাণ কামনায় দেবদুয়ারে হত্যা দিতে যাওয়া।

গুরুজন'দর দেখলে ওদের গা জ্বালা করে, তবু মনের তলায় তলায় লুকোনো থাকে তাদের কাছ থেকে এতোটুকু সপ্রশংসদৃষ্টি পাবার লোভ।

রাসমণি যখন লুব্ধ আর উজ্জ্বল চোখ মেলে বলবে "ওমা! কত আম এনেছিস কানু!" তখনি তো এতো কষ্টের পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল। কানু অবিশ্যি অবহেলা ভরে উত্তর দিয়ে যাবে "আরো কতো—ছিলো, নিলাম না! কি হবে নিয়ে"—তবু সেই উদাসীনতার অন্তরালে কণ্ঠস্বরের পুলকটুকু গোপন থাকবে না।

ফুলচুরি, মাছচুরি, আম ডাকাতির ভিতরের ইতিহাস এই। ওই প্রশংসা দৃষ্টির আকাঙ্খা। শিশুরা সহজেই তাদের ওপরওয়ালাদের লোভ আর নীতিহীনতাকে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু ক'জন অভিভাবক এসব বোঝে? নিজেদেরকে তৈরী করতে জানে না, তৈরি করতে যায় সন্তানকে। উচিতক্ষেত্রে শাসন হয় না, অথচ অসঙ্গত শাসনে শাসনে কচি মনের এই অবোধ কোমলত্বটুকু ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ফলে বস্তুহীন ভোঁতা ছেলেমেয়েগুলো হয়ে ওঠে ভীতু, মিথ্যাবাদী, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আর বস্তুসম্পন্ন তীক্ষ্ণ ছেলেমেয়েগুলো হয় বেপরোয়া, বিদ্রোহী, অবাধ্য।

কি আশ্চর্য্য!

এরা চেঁচাতে চেঁচাতে একবার নড়ছেও না তো! বরং কমলা যেন আরো গলা বাড়িয়ে আছে, আরো শক্ত কিছু বলবে বলে। আর রাসমণি দু'হাত তুলে ঝাঁপাই ঝুড়ছে, "কী বললি? আমার মুখে পোকা পড়বে? আসুক আজ দাদা, দেখাচ্ছি তোর মজা।"

কমলা দাশু মিত্তিরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাই সাহস বেশী। সে অগ্রাহ্যভরে বলে "তোমার দাদা তো আমার সব করবে!"

আড়াল থেকে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে কানু। দূর্ দূর্, এদের জন্যে আবার কষ্ট করে আম আনা! রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে এলেই

আপদ চুকে যেতো। এই কুঁদুলী ছুটোর হাতে দেওয়ার চাইতে গরুকে খাওয়ানো ভালো ছিলো। মা কানুর যতোই পৃষ্ঠপোষক হোক্, মাকেও দু'চক্ষে দেখতে পারে না কানু। মা-পিসি দু'জনকেই মনের একই স্তরে রাখে। ঝগড়া আর ঝগড়া! থাকতে ইচ্ছে করে না বাড়ীতে। আবার এও দেখা যাবে এই ঝগড়ার ফাঁকে ফাঁকেই দু'জনে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছে, এক ঘন্টা ধরে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে বসে দিব্যি চচ্চড়ির ডাঁটা চিবিয়ে চিবিয়ে ভাত খাচ্ছে এক কাঁড়ি করে। আর কোথাও কোনোখানে যাবার দরকার হলে, মেলায় কি ঠাকুরবাড়ীতে, যাত্রা গান কি পাঁচালীতে, সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে কমলা রাসমণির পায়ে পায়ে ঘুরছে।

এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য!

কানু ঠিক জানে, যে আম নিয়ে এতো কাণ্ড, ঠিক সেইগুলোই, পিসি যেই দেখবে হুমড়ে পড়বে তার ওপর। আর তখনি ছাড়াতে বসবে বঁট নিয়ে। আর এও জানে, মা দিব্যি প্রসন্নমুখে লঙ্কা মেথি গুঁড়োতে গুঁড়োতে জিজ্ঞেস করবে "সবগুলোই 'তেল আম' হবে, না গোটাকতক 'গুড় আম' করবে ঠাকুরঝি?"

রাসমণি বলবে "গুড় আমসিও করবো দু'খানা। 'কেনো' ভালোবাসে মিষ্টি আচার।"

অথচ এও নিশ্চিত, সেই গুড় আমসি ছোঁবার অধিকারও থাকবে না কানুর। নেহাৎ চুরি চামারি করে যেটুকু যা জোটে। তাও সে চুরি ধরতে পারলে আর রক্ষে নেই। 'আচার' নাকি অনাচার হয়ে গেলেই পচে যায়! আর কানু হাত দিলেই নাকি অনাচার!

বোঝো!

অথচ বলা চাই 'কানু ভালবাসে তাই করা'।

দূর্ দূর্! বড়োদের মতো মিথ্যেবাদী যদি পৃথিবীতে আর কেউ থাকে। কানু তার এই পনেরো বছরের জীবনে শুধু এই দেখে এলো। বড়োরা শুধু যা খুশি করবার আর যা খুশি বলবার কর্ত্তা! আর কোন গুণ নেই ওদের শরীরে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মেজাজ যারপর নেই খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো কানুর। দূরছাই, ফুলিটা যদি আচার তৈরী করতে পারতো, তো সব আমগুলো ওকেই দিয়ে আসতো কানু। তারপর ছুটির দিনে এক খাবলা করে নিয়ে দু'জনে ওদের চিলেকোঠার ছাদে উঠে তারিয়ে তারিয়ে—আহা !

কিন্তু নাঃ। ফুলিটা কোনো কর্ম্মের নয়। অতোবড়ো ধিঙ্গী মেয়ে হলো, এখনো আমের আচার করতে শিখলো না। আবার পাকামীটিও আছে। ও আম কুড়োতে যায়নি বলে খুব রাগ হলেও দয়াধর্ম্ম করে চারটি দিতে গিয়েছিল কানু, তা নিতেই চায় না। বলে "আমাদের অতো কাঁচা আম কি হবে ? আমাদের নন্দদা যা আমের টক রাঁধে, হি—হি—হি, একদিন খেলে জন্মের শোধ আমের টক খাওয়ার বাসনা ঘুচে যায়।"

সব বাজে কথা, আসলে না নেবার ফন্দী।

কেন নুন লঙ্কা দিয়ে এমনি খাওয়া যায় না ? সেই কথাই ব'লে অনেক 'ইয়ে' করে গোটাকতক গছিয়ে দিয়ে এসেছে মাত্র। বড়ো তাড়াতাড়ি গিন্নী হয়ে যাচ্ছে ফুলিটা ! মনে হয় যেন কানুর চোখের আড়ালে কোন অদৃশ্য পথ ধরে ছুট্ ছুট্ করে কোথায় দৌড় মারছে ফুলি, ক্রমশঃই কানুর নাগালের বাইরে চলে যাবে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়।

কমলা রাসমণির কোঁদলে ছেদ পড়লো। অধৈর্য্য কানু এবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে—কোঁচড় থেকে গুরুভার দ্রব্যগুলো ঢেলে দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে কোঁচার ছেঁড়াটা ঢাকতে ঢাকতে ঘরে ঢুকে গেলো।

ঝগড়া থামিয়ে চীৎকার করে ওঠে রাসমণি, "এই যে গুণের গোপাল এলেন ! তোমায় দিব্যি দিচ্ছি নতুনবৌ, যদি ছেলেকে এখন সোহাগ করে মুড়কির মোয়া খেতে দেবে ! ও ছেলেকে তিনবেলা উপোস দিয়ে

রেখে দিলে তবে জব্দ !···ও মা ! কী সর্ব্বনাশ ! এতো আম ? এতো আম কুড়িয়েছে মুখপোড়া !" রাসমণির কণ্ঠে পুলক গোপন থাকে না —"এ যে কাছারীর বাগানের আম মনে হচ্ছে ! আহা কী রূপ আমের ! শীগগির একটা ঝুড়ি এনে ঘরে তুলে ফেলো নতুনবৌ, দাদা দেখলে আর রক্ষে রাখবে না।"

ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখে কানু।

ছেলেকে মুড়কির মোয়া খাওয়ানোর বাসনা তো কই দেখা যায় না কমলার ! বরং ঠাকুরঝির নির্দ্দেশ পালন করতেই তৎপর হয়ে ওঠে। চট্‌পট্ একটা ঝুড়ি এনে তুলতে থাকে, আর অনবরত তাজা মটমটে আমগুলো বেছে বেছে আলাদা করে রাখতে থাকে।

কাঁচা আমে ভারী লোভ কমলার, কিন্তু অম্বলের রুগী বলে ওসব খাবার অনুমতি নেই তার। তবু কমলা কুপথ্য করে লুকিয়েচুরিয়ে। কানু তার সাক্ষী, মাঝে মাঝে কানুই কুপথ্যের সংগ্রহকারক। কানুকে অবশ্য কমলা নিজের দলের বলেই মনে করে, তাই ওর কাছে লুকোয়না। কিন্তু কমলা জানেনা মায়ের এই ক্ষুদ্র আচরণ ছেলেকে তার কি পরিমাণ ক্ষিপ্ত করে তোলে। কানু মায়ের আদেশ হয়তো পালন করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাকে ঘৃণা করতে শেখে। যে ছেলেকে সে নিজের দলের ভেবে পরম নিশ্চিন্ত, সে ছেলে যে ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃই দলছাড়া গোত্রছাড়া হয়ে চলেছে এ বোঝবার বুদ্ধি কমলার নেই।

কিন্তু কেন ক্ষেপে যাবেনা কানু ?

একদিন কানু পেট খারাপের ওপর পেটের জ্বালায় লুকিয়ে বাগানে পাতা জ্বেলে হাঁসের ডিম সিদ্ধ করে খেয়েছিল বলে কী লাঞ্ছনাটাই হয়েছিলো তার ! বাবা বলেছিলেন "ওর জন্যে যদি কেউ ডাক্তার খরচ করতে বলে তো, দাশুমিত্তির তাকেই ধরে ঠ্যাঙাবে"। পিসি বলেছিলো "এতোখানি বয়সে এতো-এতো বদমাইশ ছেলে দেখেছি, কেনোর মতো এতোবড়ো ফিচেল বদমাইশ ছেলে দেখিনি। বাগানে

গিয়ে নিজে রেঁধে খাওয়া! কী বুকের পাটা!" কাকা বলেছিলো মিচকে মিচকে হেসে—"হেঁসেলের ভারটা এবার থেকে আমাদের কানুবাবুর হাতেই তুলে দেওয়া হো'ক না? রান্নাবান্না যখন সবই শিখে ফেলেছে! আর এর পর ওই রাঁধুনীগিরি কি চাকরগিরি করেই তো খেতে হবে! তাছাড়া ওর হবে কি!"

আর মা, ওই হাড়জিরজিরে অম্বলের রুগী কমলা, যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আর তাজা মটমটে আমগুলো কোঁচড়ে পুরছে, সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলো "এ্যাঁ! আমার গর্ভে এমন 'লুভিষ্টে' ছেলে জন্মেছে! দেখে যে আমার বিষ খেতে ইচ্ছে করছে গো!"

কোন মুখেই যে কথা কয় বড়োরা!

ছোটদের ওরা ভাবে কি? অবোধ, অজ্ঞান, হাবা-গোবা? অথচ বড়দের কাজে আর কথায় অসঙ্গতির নির্লজ্জতাটা যে ছোটদের চোখেই আগে ধরা পড়ে, এ বোধ ওদের নিজেদেরই নেই।

কানু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, জন্মেও আর আম কুড়োবে না। নয়তো—যদি কুড়োয়, সেগুলো মুন্সি পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে আসবে।

রাতে খবরটা কেউ টের পায়নি।

ভোরেও নয়।

চনচনে বেলায় কে যেন গঞ্জের হাটে যাবার জন্যে সর্টকাট করতে চণ্ডীতলার পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, সেই এসে খবরটা রাষ্ট্র করলো। গঞ্জের হাটে সওদা করতে যাওয়া তার মাথায় উঠেছে, সে এখন প্রত্যক্ষদর্শীর অপার গৌরব নিয়ে টাউনের মধ্যমণি হয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রথমটা ফিসফিস্, তারপর চাপা আন্দোলন, শেষ অবধি আর সামলানো গেলোনা। আগুনের হলকার মত সারা সহরে ছড়িয়ে পড়লো খবরটা।

কালকের ঝড়ে চণ্ডীতলায় পাগলাবাবা বাজ পড়ে মারা গেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী একই রিপোর্ট একশোবার পেশ করতে করতে ক্রমশঃ কাহিল হয়ে পড়ছিলো। তবু বলতে হচ্ছে তাকে। ভয়ানক, বীভৎস, শোচনীয়, মর্মান্তিক, এই সব শুনতেই তো মানুষের সবচেয়ে আনন্দ! শোনবার জন্যে হাঁ করে থাকে একেবারে।

"অমুকের ছেলেটি ভালো করে পাশ করেছে"—এ শুনতে আর কী এতো আমোদ? "অমুকের ছেলেটি যে মারা গেলো—" এ শুনলে কানখাড়া করে ছুটে আসবে সবাই। এই স্বভাব মানুষের!

পাগলাবাবা সকলেরই পূজ্য ছিলেন। কিন্তু পাগলাবাবার এই শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর খুঁট-নাটি বিবরণীটি ফেনিয়ে ফেনিয়ে শোনবার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব।

লোকটা বলছিলো—"টের পেতনা কেউ, অমনি পোড়াকাঠ হয়ে পড়ে থাকতেন। বজ্রাঘাতের মড়া শেয়াল শকুনেও ছুঁতো না! বিধাতার নির্দ্দেশ, আমার কেমন মনে হলো এতোটা এসেছি তো আর একটু ঘুরে একটা পেন্নাম ঠুকে যাই।...উঃ গিয়ে সে কী দৃশ্য! এখনো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!"

দৃশ্য এই, চণ্ডীতলায় মড়াপোড়ানো ঘাটের ঠিক ডানদিকে যেখানে পাগলাবাবার আস্তানা ছিলো, সেইখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন তিনি, কাঠের মত শক্ত আর পোড়া কয়লার মত দেহটা নিয়ে!

রাত-বিরেতে ঝড়বৃষ্টিতে শ্মশানযাত্রীদের বসবার জন্যে যে ঘরটা বানানো আছে শ্মশানের ধারে, পাগলাবাবাও তো ঝড়ে জলে সেখানটায় উঠে যেতেন, কালকের সেই প্রবল ঝড় বিদ্যুতের সময় বাইরে ছিলেন কেন, এই এক রহস্য!

পাগলাবাবার মনও কি এই ঝড়ের মাতনে পাগলা হয়ে উঠেছিলো কাঁচা আম কুড়োতে? তাই বেরিয়ে পড়েছিলেন 'মা চণ্ডী'র ফল বাগানের উদ্দেশে?

ফিসফিসানি চাউর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই বজ্রাহত! পাগলা বাবার এ কী পরিণতি!

দেশসুদ্ধ লোকের ভয়ভক্তির পাত্র ছিলেন যিনি, ছিলেন ভূত-ভবিষ্যৎ বক্তা, যিনি নাকি—আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন অবলীলায়, শূন্যপথে উড়ে যেতে পারতেন, পারতেন মরাকে বাঁচাতে, জ্যান্তকে মন্ত্র পড়ে ভস্ম করতে, শ্মশান থেকে মরামানুষের খুলি খুলে নিয়ে গিয়ে যিনি ঝুলিতে জমাতেন মদ খেতে, সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পাগলাবাবার এই পরিণাম !

এতো লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ গুণে দিয়েছিলেন পাগলবাবা, শুধু নিজের ভবিষ্যৎটাই গুণতে ভুলে গিয়েছিলেন ?

"ব্রহ্মশাপ !"

"ব্রহ্মশাপ না থাকলে বজ্রাঘাত হয় না !" "নিশ্চয় পূর্ব্বজন্মের কোনো মহাপাপে—!" "আমাদের একটা মস্ত ভরসা গেলো ! ছেলে-পুলের রোগ অসুখ হলেই ছুটে গিয়েছি। আহা যতোদিন ছিলেন দেশে একটা বিপদ আপদ হয়নি।"………

কথাটা অবশ্য খুব ঠিক নয়, সাত আট বছর ধরে এখানে রয়েছেন পাগলাবাবা, বিপদ সম্পদ যা হবার ঠিকই হয়ে চলেছে, কিন্তু বেশী আবেগের সময় এমন কথা বলেই থাকে লোকে, আর সে সময় কেউ প্রতিবাদও করে না।

চণ্ডী-ভক্তেরা আবার মা চণ্ডীকে দূষছেন। "মা চণ্ডী ! একি করলি ? তুইতো জাগ্রত মা, তবে সন্তানকে রক্ষে করতে পারলিনে ?"

স্কুল খোলা থাকলে আজ স্কুলের নাম-ডাকা খাতায় নামের পাশে সব ছেলেরই ঢেরা পড়তো নিশ্চিত, গ্রীষ্মের ছুটি আছে তাই কামাইয়ের দায়ে রক্ষা ! কিন্তু অনেকগুলো ছেলেই আজ স্কুলের মাঠে গিয়ে জমা হয়েছে। শলা ষড়যন্ত্র করতে জায়গাটা ভালো। ছুটির সময় দিব্যি নির্জন নির্জন !

বাড়ীতে জানলে কেউ অনুমতি দেবেনা নিঃসন্দেহ, তাই চুপি চুপি বেরিয়ে পড়বার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বলাবাহুল্য নির্বাচিত গম্যস্থলটা হচ্ছে

চণ্ডীতলা। সকাল থেকে শোনা তো হলো ঢের, কিন্তু সেই অদ্ভুত অপূর্ব্ব দৃশ্যটা তো দেখা চাই! কে জানে জীবনে আর কখনও বাজে-পোড়া মড়া দেখবার সৌভাগ্য হবে কি না। সকাল থেকে কাতারে কাতারে লোকও যাচ্ছে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে। স্কুলের এই উৎসাহী ছেলে ক'টাই বা বঞ্চিত থাকবে কেন?

কিন্তু মাঠে এসে অনেকেরই সাহস হরে যাচ্ছে, কারণ হিসেব হচ্ছে এই বিকেলবেলা বেরোলে যতো ছুটেছুটেই যাওয়া আসা হোক, সন্ধ্যার আগে ফেরার সম্ভাবনা নেই। বরং রাত হয়ে যাওয়াটাই সম্ভব।

অনেকগুলি উৎসাহীই খসলো।

তারা ম্লানমুখে বললো "দেরী হয়ে গেলেই বাড়ীতে টের পাবে। আর তা'হলেই তো ভাগ্যে যা ঘটবে—"

কানু এদের দলের সর্দ্দার, সে বিরক্তভাবে বলে "ভাগ্যে নতুন আবার কি ঘটবে শুনি? খানিক পিটনচণ্ডী, এই তো? মেরে তো আর ফেলবেনা? আর ফেললেই বা দুঃখু কি? মরে গেলে তো ফুরিয়েই গেলো, ওদের হাত এড়িয়ে সগ্‌গে চলে যাবো, ভালোই হবে।"

এহেন আশ্বাসবাণীতেও কিন্তু বিশেষ আগ্রহ কেউ দেখায় না। তাদের মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় আপাততঃ স্বর্গসুখের বাসনা তাদের প্রাণে তেমন জোরাল নয়।

শেষ পর্য্যন্ত সংকল্পে স্থির থাকলো জনা চারেক। কানু তো আছেই, সে তো বলেছে কেউ না গেলেও সে যাবে, কারণ তার নাকি সেখানে যাওয়া অবশ্য অবশ্য দরকার। তাছাড়া টিঁকে রইলো রমেশ, সত্যশরণ আর নীরেন।

সত্যশরণ আবার ওরই মধ্যে একটু বোকাবোকা, সে হঠাৎ ফট্ করে বলে বসে "যাবার জন্যে তোড়জোড় তো দেখছি কানুরই সবচেয়ে বেশী, কিন্তু পাগলাবাবার জন্যে কানুর তো কিছু দুঃখু দেখছি না।"

রমেশ জানে কানু বদরাগী, কিসে কি হয় বলা যায় কি, সে তাড়াতাড়ি বলে "না, দুঃখু দেখছিস না! কি যে বলিস! বলে পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের দুঃখু হলো—"

কানু কিন্তু একেবারে উল্টো গেয়ে চমকে দিলো বেচারা রমেশকে। মুচকে হেসে চোখ নাচিয়ে বললো "পৃথিবীসুদ্ধ লোকের দুঃখু হলেও আমার হয়নি। সত্তে ঠিকই বলেছে।"

রমেশ নীরেন আহত বিস্ময়ে বলে "তোর দুঃখু হয়নি?"

"নাঃ! কেন এতে আবার দুঃখু কষ্ট কিসের?"

"তবে যাচ্ছিস যে?"

বোকার মত বলে ওরা।

কানু আর একটু মিচকি হাসি হেসে বলে "যাচ্ছি তোদের শোকে সান্ত্বনা দিতে।"

সত্যি বলতে, কানুকে সকলেই একটু ভয়ভয় করে, কাজেই আর বেশী কথা তোলে না। কি জানি বাবা, কি ওর খেয়াল! পাগলাবাবার এমন দুঃখাবহ মৃত্যুতেও দুঃখকষ্টের কারণ যে খুঁজে পায়না, সে আবার তাদের শোকে কি সান্ত্বনা দেবে, সেও তো বুদ্ধির অগম্য।

খানিকটা গিয়ে রমেশও বলে বসে "যাচ্ছি তো—কিন্তু ভাবছি—"

"কি ভাবছিস?" তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে কানু।

"ভাবছি শ্মশানটশান জায়গায় সন্ধ্যে হয়ে যাবে—"

"তবে আর কি, ভূতে খেয়ে ফেলবে তোকে! যা বেরো, যেতে হবে না, মার কোলে শুয়ে দুধ খেগে যা।"

"আহা তা' নয়! মানে—"

"মানেফানে রেখে দে! তোর মানের ধার কে ধারে? ফুলিটারও আজকাল এই রকম প্যাকামী হয়েছে, ডাকতে গেলাম, এলোনা। বলে

"ওমা! এই অবেলায় তোমরা শ্মশানে যাচ্ছো—তোমাদের কি ভয়ডর নেই?' দেখতে পারিনা এই সব পাকামী।"

ফুলি!

"ফুলিকে ডাকতে গিয়েছিলি?" সত্যশরণ অবাক হয়ে বলে ওঠে "ফুলি যাবে আমাদের সঙ্গে চণ্ডীতলায়?"

"কেন? যাবেনা কেন?" কানু ভুরু কুঁচকে বলে "ফুলির পা নেই? তোর চেয়ে ফুলি বেশী হাঁটতে পারে, বুঝলি?"

সত্যশরণ গম্ভীরভাবে বলে "হাঁটার কথা হচ্ছেনা। মেয়েমানুষ আবার আমাদের সঙ্গে অতো দূরে যাবে কি?"

"মেয়েমানুষ তা কি?" দস্তুরমতো ঝেঁজে ওঠে কানু—"মেয়েমানুষ মানুষ নয়? এই রকম করে করেই তো শেষ অবধি মেয়েমানুষগুলো পেত্নী হয়ে ওঠে। যেমন হচ্ছে ফুলিটাও।" জোরে জোরে পা চালায় কানু।

"কানুটা কি রাগী বাবা।"

রমেশ ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে মন্তব্য করে। আর বোকা হাবা সত্যশরণ বলে বসে "হুঁ, তার ওপর আবার ফুলির কথা।"

কানু চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লো, সন্দেহ সন্দেহ ভাবে বললো "ফুলির কথা তা কি?"

"কিছুনা তো।"

ভয় পেয়ে নিরীহ ভাব দেখায় সত্যশরণ। কিন্তু কানুর কাছে রেহাই নেই। সে ক্রুদ্ধভাবে বলে "এমনি মানে? বল ও কথা বললি কেন?"

সত্যশরণ ব্যাপারটাকে শুরু থেকে নামতে আনবার প্রয়াসে ফিক করে হেসে ফেলে বলে "আহা যেন বোঝেন না কিছু!"

পড়ন্ত রোদে তাড়াতাড়ি হাঁটার এমনিতেই মুখ লাল হয়ে উঠেছিলো কানুর, এর ওপর প্রচণ্ড রাগে গনগনে আগুনের মত দেখায়। কে জানে ফুলির উল্লেখে ওর অতো রাগ কেন! হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে

সত্যশরণের গালে ঠাশ করে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে "ফের বলবি ও কথা ? বল শীগগির।"

চড় খেয়ে চড়ে উঠবে না, এতো নিরীহ তা'বলে সত্যশরণ নয়। সে এক ঝটকায় সরে গিয়ে বলে "বলবোই তো ! একশোবার বলবো, হাজারবার বলবো। সবাইকে বলে দেবো, দেখিস তখন মজা !"

কানু তেড়ে এসে প্রায় বাঘের মতন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে "বলে দিবি মানে ? কি বলে দিবি ? বল কি বলে দিবি ?"

"কিছুনা কিছুনা—" চীৎকার করে ওঠে সত্যশরণ "ওরে বাবারে ঘাড় কামড়ে ধরেছে—"

রমেশ আর নীরেন কোনোপ্রকারে ছাড়িয়ে নেয় দু'জনকে, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে। দেখা গেলো সত্যশরণের সার্টের এক টুকরো কানুর দাঁতে উঠে এসেছে, আর সত্যশরণের সেই কামড়ের জায়গায় রক্ত ফুটে উঠেছে।

"ছি ছি কি করলি বল দেখি"—রমেশ আপোসের চেষ্টা করে— "শুধু শুধু আরো বেলা চলে গেলো। নে এখন চল !"

কিন্তু সত্যশরণ তখন ফিরে দাঁড়িয়েছে। বোকারা যখন রাগে তখন গোঁয়ার হয়ে ওঠে। ও বুনো ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলে "যাবো ? ওই কেনো রাস্কেলের সঙ্গে ফের যাবো আমি ? দাঁড়া না—এখুনি গিয়ে ওর কীর্ত্তি দেখাচ্ছি ওর বাবাকে।"

নাগালের বাইরে গিয়ে ভেঙচি কেটে সত্যশরণ শাসিয়ে যায় "কপালে তোর আজ কি দুর্গতি জোটে দেখিস !"

হ্যাঁ, কপালে সেদিন অনেক দুর্গতিই জুটেছিলো। কীল চড় লাথি গাঁট্টা, খেতে না দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা প্রভৃতি ছেলে শাসন পদ্ধতির কোনো বিধিই বাকী রাখেননি বদমেজাজি দাশু মিত্তির। পরের ছেলের ঘাড়ের রক্তবিন্দুটি দেখে তাঁর দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু জ্বলে উঠেছিলো।

তবু এসবে আজ আর কাবু করতে পারেনি কানুকে। সব কিছু অনুভূতি ছাপিয়ে চণ্ডীতলার শ্মশান আর পাগলাবাবার সেই বীভৎস মূর্ত্তিটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো তাকে।

সারাদিনে দর্শক এসেছিলো দেদার, কিন্তু সেই হুমড়ে পড়ে থাকা দেহটাকে তুলে ঘুরিয়ে শুইয়ে দেবার চেষ্টা কেউ করেনি। শুধু হা হুতোশ করেছে, আর উদ্দেশে একটা করে প্রণাম ঠুকে গেছে।

সেই প্রায়-উলঙ্গ বাজে-পোড়া দেহখানা সমস্ত দিনের রৌদ্রে কী কদর্য্য কালোই হয়ে উঠেছিলো! মাছি উড়ছিলো চারপাশে, আর খানিকটা দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছিলো সাধুর সম্বল লোহার চিমটে আর কাঠের কমণ্ডলুটা। কিন্তু আরো একটি জিনিস যে সাধুর ঐ ধুনির ভস্মের মধ্যে লুকোনো আছে সে কথা আর কে জানে, কানু ছাড়া?

কানু জানে! আর জানে বলেই তো এখানে আসার নিতান্ত প্রয়োজন ছিলো ওর। জানে বলেই তো পাগলাবাবার শোচনীয় মৃত্যুর খবরেও ওর প্রাণে হাহাকার জাগেনি। কিন্তু কি হয়ে গেলো! সমস্ত রাত শুধু সেই কথাই ভেবেছে কানু, না ঘুমিয়ে।

ওরা যখন পৌঁছেছিল, তখন বেলা পড়ে এসেছে, কৌতূহলী দর্শকের ভীড়ও কমে এসেছে, তবুও ছিলো পনেরো কুড়ি জন।

তাদের ঠেলেঠুলে, আর তাদের 'হাঁ হাঁ' করা প্রতিবাদ সত্তেও সাধুর দেহটাকে ঘুরিয়ে শুইয়ে দিয়েছিলো কানু।

যারা উপস্থিত ছিলো তারা প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলো "একী! এ কী! কী সর্ব্বনেশে ছেলেরে বাবা! এই ভর সন্ধ্যেবেলা বাজে পোড়া তান্ত্রিকের শবদেহ ছুঁলো!" "কে ও? দাশু মিত্তিরের ছেলে না?" "হুঁ! সাংঘাতিক ছেলে!"

ছোঁয়ার দোষ বাঁচাতে সরে দাঁড়িয়েছিলো সবাই, কিন্তু কানুর ওসবে দৃক্‌পাত ছিলো না। ও তখন আগ্রহব্যাকুল চিত্তে ধুনির ছাই

হাতড়াচ্ছিলো। বেশী হাতড়াতে অবিশ্যি হয়নি, ছাই তো আর ছাই ছিলো না, কালকের বৃষ্টিতে কাদা হয়ে গিয়েছিলো। সেই কাদার মধ্যে থেকে কালো চক্‌চকে একটি শিলাখণ্ড বার করে ফেলেছিলো কানু, তিনবার নিজের কপালে ঠেকিয়ে আস্তেআস্তে একবার ঠেকিয়েছিলো পাগলাবাবার বুকে। উপস্থিত দর্শকরা অবাক্ হয়ে দেখছিলো ছেলেটার কাণ্ডকারখানা। দেখলো পাথরটা ঠেকিয়ে ছেলেটা—যাকে বলে বিস্ফারিত নেত্র—সেই ভাবে তাকিয়ে রইলো পাগলাবাবার অসাড় পাথরের মতো দেহটার দিকে। যেন অদ্ভুত কিছু, অলৌকিক কিছু আশা করছে পাগলাবাবার কাছে, কেমন যেন একটা নিশ্চিত আশার ছাপ তা'র মুখে!

তারপর ব্যাকুল হয়ে উঠলো ছেলেটা, পাগলের মতো বারবার সেই পাথরখণ্ডটুকু ঠেকাতে লাগলো নিজের কপালে আর পাগলাবাবার বুকে, বারবার কি এক প্রতীক্ষায় চোখ বড়োবড়ো করে তাকিয়ে থাকলো। ক্রমেই যেন ভীষণ হয়ে উঠলো তার মুখটা, ফুলে উঠলো কপালের শিরা, আর অবশেষে পাথরটা দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেলো ভীড়ের দিকে পিছন করে।

যারা চেনেনা, তারা বলাবলি করতে লাগলো "ছোঁড়াটা ক্ষ্যাপা নাকি?" যারা চেনে, বললো "উঁহুঁ, ছেলেটা নিশ্চয় কোনরকম তুক্‌তাক্ শিখেছে, তাই তান্ত্রিকের শবদেহ নিয়ে কিছু ক্রিয়া করে গেলো।"

কিন্তু পাথরটার সন্ধান ও পেলো কোথায়?

কে জানে, হয়তো বা পাগলাবাবার কাছে আসা যাওয়ার ছুতোয় লক্ষ্য করে রেখেছিলো!

'সিদ্ধশিলা' বোধহয়!

কিন্তু নিয়ে গেলো না তো!

তা'ও তো বটে!

আচ্ছা অতটুকু ছেলে, ও আবার শিখবে কি ?

কি জানি বাবা ! তবু যাবার সময় কিভাবে চলে গেলো দেখলে না ? কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে ! কিছু তুকতাক না হলে—

তা' সত্যি ! তুকতাকের ব্যাপারেই এমনটা হওয়া সম্ভব।

তবে হয়তো বা পাগলাবাবাই কিছু শিখিয়েছিলেন। প্রায়ই আসতো বটে ছোঁড়া এখানে।

হ্যাঁ, প্রায়ই আসতো বটে কানু এখানে।

অলৌকিক রহস্যের প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিলো তার। ছিলো নিশ্চিত একটা বিশ্বাস।

ক্লাশ পরীক্ষার আগে আর পরে, কিম্বা কোন কিছু ভুলভ্রান্তি করে ফেললে, আসবেই আসবে কানু। ফুলিও এসেছে আগেআগে ওর সঙ্গে।

পাগলাবাবার পদ্ধতি ছিলো ছেলেপুলে দেখলেই প্রথমটা চিমটে নিয়ে তেড়ে আসা, সে দৃশ্য দেখলেই ভয়ে খানিকটা পালিয়ে আসতো ফুলি। কিন্তু কানুর এসব পদ্ধতি মুখস্থ। সে গম্ভীরভাবে পকেট থেকে একটা আনি কি চৌকোটে পয়সা বার করে প্রণামীর ভঙ্গীতে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নমস্কার সারতো দুটি হাত জোড় করে।

কটমট করে তাকিয়ে প্রণামী তুলে নিয়ে পাগলাবাবা যেন নিতান্ত কৃপাভরে বলতেন 'বৈঠ্'। তখন আবার ফুলিও গুটি গুটি এসে কানুর পিছনে বসতো।

ধুনির আড়াল থেকে শিলাখণ্ডটুকু বার করে পাগলাবাবা আস্ফালনের ভঙ্গীতে বলতেন "হামার এই পাথল দেখতা হ্যায় ? নাম আছে 'মন্ত্র শিলা !' 'মন্ত্র শিলা !' সমঝা ? এই শিলা পরশন করিয়ে হামি সব লোগ্‌কে মারতে পারি, ফিন্ জীয়াতে পারি।"

"সব লোককে ? পৃথিবীর সব লোককে ?" স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করতো কানু।

সাধু অবলীলাক্রমে উত্তর দিতেন "সব—সব ! বিলকুল।"

"আর, পাথর ঠেকিয়ে এক্‌জামিনে পাশ করিয়ে দিতে পারো না ?"

"একজামিন্ !"

সাধু সন্দেহযুক্ত দৃষ্টিতে তাকাতেন। যেন সেটা আবার কি বস্তু !

কানুর হিন্দী ভাষার ভাণ্ডার জোরালো নয়, সে বলতো "জানতা নেই ? পরীক্ষা জানতা নেই ?"

"পরীক্‌ষা ? আস্কুলমে ?"

"হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! পারোনা পাশ করিয়ে দিতে ?"

"জরুর ! লেকিন্ পৈসা দিতে হোবে।"

শ্মশানচারী সাধুর পয়সার প্রয়োজন কি, এ কূট প্রশ্ন কানুর মাথায় কোনদিন আসেনি। সে কতকটা প্রস্তুত হয়েই আসতো। আর পকেটে হাত ঢোকাবামাত্রই পাগলাবাবার মুখের রেখায় প্রসন্নতার ছাপ পড়তো।

এক দিন—

সেদিন ফুলি ছিলো সঙ্গে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফস্ করে বলে বসেছিলো কানু "আমি যদি মরে যাই, ওই পাথর দিয়ে বাঁচাতে পারবে ?"

"ক্যা ?"

বলাবাহুল্য সবটা ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া কানুর পক্ষে সম্ভব ছিলো না, সে নিজের বুকে হাত দিয়ে, চোখ উল্টে এবং জিভ বার ক'রে ইসারায় মৃত্যু কথাটাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, আর পুনর্জীবনের ভঙ্গীও করেছিলো। সাধু বড়ো গলায় বলেছিলো "জরুর !"

বুকের ভিতর উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো কানুর, আনন্দে চোখে জল এসেছিলো।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্পূর্ণ পদ্ধতিটা শিখেও নিয়েছিলো।

ফেরার পথে ফুলিকে চুপি চুপি উপদেশ দিয়ে রেখেছিলো কানু, তেমন দুর্দ্দিন এলে ফুলির কর্ত্তব্যটা কি।

কিছু না। গোটা কতক বেশী করে পয়সা নিয়ে গিয়ে পাগলাবাবার কাছ থেকে 'মন্ত্রশিলাটা' একবার নিয়ে এসে তিনবার নিজের কপালে ছুঁইয়ে একবার মরা কানুর বুকে ঠেকানো!

ব্যস!

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে তাকাবে কানু। চোখ নড়বে, বুক নড়বে, সারা দেহটা নাড়িয়ে ধড়মড় করে উঠে বসবে তখন কানু।

সেই আশাস্পন্দিত বুক নিয়েই তো আজ চণ্ডীতলায় আসা কানুর। যখনি শুনেছিলো, তখনি আসতো। কিন্তু দুরন্ত একটি লোভ ছিলো— এই ভয়ঙ্কর অলৌকিক কাণ্ডটা, যেটা কানুর দ্বারা সংঘটিত হবে, সেটা সহপাঠিরা দেখুক। তাই তাদের জড়ো করতে গড়িয়ে গিয়েছিলো বেলা।

কিন্তু তাদের সামনেই এই অপদস্থ!

পাথরটা ঠেকিয়ে দৃষ্টি ঠিকরে অপেক্ষা করেছে কানু, সেই পোড়া কয়লার মতো দেহটা কিভাবে নড়ে ওঠে!

না, দেহটা নড়ে ওঠেনি।

নড়ে উঠেছিলো শুধু একটি কিশোর চিত্তের বিশ্বাসের ভিত!

পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজো হয় মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ীতে। চিরাচরিত প্রথায়। গৃহিনীহীন গৃহেও সে প্রথাটা রেখেছেন মাষ্টার মশাই। বিধবা মেয়েটা অর্থাৎ ফুলির মা মারা যাবার পর থেকে পাড়ার অভিভাবিকা হিসেবে রাসমণিই 'উয্যুগের' ভার নিয়েছিলো, এ যাবৎ সেই প্রথাই বলবৎ।

ব্রতের 'কথা' শুনতে পাড়ার সকলেই প্রায় আসে। প্রসাদ পায়। একটুকরো শালপাতায় সামান্য পরিমাণ কাঁচাশিন্নি, দু'খানা বাতাসা, এক

টুকরো আখেরগুড়ের পাটালি, আর টুকরো কয়েক শশা কলা। এই প্রসাদ। তথাপি তাতে নিষ্ঠা ও ভক্তির অভাব কারো ছিলো না। ৺সত্যনারায়ণের 'কথা' হচ্ছে জেনেও শুনতে যাবে না, বাড়ী বসে থাকবে, প্রসাদের পরিমাণ তুচ্ছ বলে অবহেলা করবে, এমন কথা অন্ততঃ মফস্বলের লোকেরা তখনো ভাবতে শেখেনি।

তা'ছাড়া মাষ্টারমশাই ছিলেন দেশসুদ্ধ সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

কানুর বরাবরই এদিনে বিরাট উৎসাহ।

দূর দূরান্তরের পথ ভেঙে ফুল সংগ্রহ করে আনে সে ঝুড়ি বোঝাই করে, ফুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মালা গাঁথে চৌকী ঘিরতে। আর সত্য-নারায়ণে যতোটা ভক্তি থাক না থাক, তাঁর প্রসাদে অটুট ভক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে।

কিন্তু এবারে সে নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো। কানু ফুল আনলো না, ব্রতমাহাত্ম্য শুনলো না এবং প্রসাদ খেলো না। এ বাড়ীতে এসেছে বটে, বোধহয় না এসে পারেনি বলেই এসেছে, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে তার দর্শন পাওয়া যায়নি। বাইরের দাওয়ায় গম্ভীরমুখে বসে একখানা বই ওল্টাচ্ছে।

সকালবেলা থেকেই ভাবান্তর ধরা পড়েছে ফুলির কাছে।

"আমি ফুলটুল আনতে পারবো না"—শুনে স্তম্ভিত ফুলি প্রথমটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি, তারপর কানুর অনমনীয় মনোভাব দেখে অভিমানে ভারভার হয়েছিলো। আলপনা দিয়েছে, মালি-বৌ প্রদত্ত সামান্য ফুলে মালাও গেঁথেছে, রাসমণির নির্দ্দেশে করেছে সবই, কিন্তু কেমন যেন মনমরা ভাবে। তবু 'কথা' আরম্ভের সময় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো বেচারা। কানুদার দুর্মতিটা যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, সত্যনারায়ণের কাছে তারই প্রার্থনা জানিয়ে ডাকতে গিয়ে-ছিলো "কানুদা এবার 'কথা' আরম্ভ হবে চলো।"

"আমি যাবো না।"

নিশ্চিত স্বরে উত্তর দিয়েছিলো কানু।

"যাবে না?"—ব্যাকুল প্রশ্ন করে ফুলি—"কথা শুনতে যাবে না?"

"নাঃ! শুনে কি হবে? ও সব সত্যনারায়ণ ফারায়ণ সব বাজে।"

ফুলি শিহরিত কলেবরে বলে উঠেছিলো—"পাগলের মতো কি বলছো কানুদা?"

"পাগল আবার কি! ঠিকই বলছি। যারা ওই সব মানে তারাই পাগল। ঠাকুর টাকুর সব মিথ্যে বুঝলি, সব মিথ্যে। ব্রতকথাগুলো স্রেফ বানানো। ও সত্যনারায়ণ, মা চণ্ডী, কারুরই কিছু ক্ষ্যামতা নেই। শুধু শুধু ঠাকুর হ্যান্ করলো ত্যান্ করলো, মরা বাঁচালো, ডোবা জাহাজ ভাসালো, এই সব বানানো কথা শুনে লাভ? শিন্নিতে আমি পা ঠেকাতে পারি, বুঝলি? বিশ্বাস না হয় আন! তোর সামনে ঠেকাচ্ছি।"

কাঁপন্ত বুকে সরে পড়েছিলো ফুলি, আর কথা বলতে সাহস পায়নি। চোখ ফেটে জল এসেছিল তার। আর কিছু নয়, পাগলা হয়ে গেছে কানু। আর পাগলাবাবার মড়া ছোঁয়ার ফল সেটা! হ্যাঁ—নিশ্চয় তাই।

নীরেন আর রমেশ বেশ ডালপালা সহযোগেই তো সেদিনকার অভি-যানের গল্প করে গিয়েছিলো—এ বাড়ীতে এসে। মাষ্টারমশাইয়ের পালিত ছাত্রগুলি তো ওদেরই সহপাঠি।

হ্যাঁ—ঠিক! সেইদিন থেকেই কানুর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে ফুলি। কানুর চোখ লাল, দৃষ্টি রুক্ষ, সমস্ত প্রিয় খেলাধূলোর প্রতিই যেন ঔদাসীন্য।

তারপর আজ এই সর্ব্বনেশে কথা!

সন্দেহের অবকাশ নেই, ভূতাশ্রিত হয়েছে কানু।

বাড়ীতে নানা লোকের ভীড়।

বারেবারেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছতে লাগলো ফুলি, কাউকে কিছু বলতে পারলো না।

কিন্তু প্রসাদ বিতরণকালে কানুর অনুপস্থিতি রাসমণির চোখ এড়ালো না। সে হাঁক দিলো "কানু কোথায় রে ফুলি ?"

"ওই যে—ইয়ে বাইরের দাওয়ায়।"

"পেসাদ না নিয়ে একখুনি আবার তাড়াতাড়ি বাইরে যাওয়া কেন ?" রাসমণি সন্দেহের স্বরে বলে "কথা শোনার সময় ছিলো তো ?"

ফুলি ঢোক গিলে বলে "দেখতে পাইনি।"

কথাটা মিথ্যে নয়, দেখতে তো সত্যিই পায়নি। বারেবারেই তো ভিড়ের পিছন দিকে চোখ ফেলেছে, যদি পরে অনুতপ্ত হয়ে এসে বসে থাকে, কিন্তু না, দেখতে পায়নি সেই পরিচিত মুখটি।

রাসমণি ভুরু কুঁচকে বলে "উঁহু, আমি তো কই দেখিনি তাকে! গুণ বাড়ছে বুঝি! ঠাকুরদেবতাকে অগ্রাহ্যি করতে শিখছে? নির্গুণ কিংশুকের তবু ওই গুণটুকু ছিলো—দেব-দ্বিজে ভক্তি, তাও যাচ্ছে! ......কেনো, কেনো, এই কেনো লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মরণ-বাড় বেড়েছে তোমার কেমন ?"

পাঁচজনের ভাগ একজনের পাতায় গুছিয়ে নিয়ে মূল-নৈবিদ্যের বড়ো মণ্ডাটি তাতে যোগ করে ভাইপোর উদ্দেশে যাত্রা করলো রাসমণি।

কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া ছেলের এতোবড়ো দুঃসাহস হবে, একথা ভাবতেই পারেনি রাসমণি। ব্রতকথা শুনুক না শুনুক, মুখের ওপর স্পষ্ট বললে "পেসাদ খাব না!" রাসমণি কি নিজের মাথা দেওয়ালে ঠুকবে, না এই ভ্রংশবুদ্ধি ছেলেটার মাথাতেই হাতের থালাটা ছুঁড়ে মারবে ?

না, সে সব অবিশ্যি করেনি রাসমণি পাঁচজনের মাঝখানে। শুধু দাঁত কিড়মিড় করেই যতোটা ঝাল মেটাতে পারে মিটিয়েছে। কিন্তু এই ভয়ানক ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে পারেনি। বাইরের লোকজন চলে গেলে, উপবাসী মাষ্টারমশাইকে জল খাইয়ে পেড়েছে কথাটা।

কাঁদোকাঁদো হয়ে বলেছে "চাটুয্যে কাকা, আপনি থাকতে ছেলেটা একেবারে 'বয়ে' যাবে ?"

শিবনাথ চাটুয্যে এই আকস্মিক নালিশে চমকে উঠে বলেন "কার কথা বলছো রাসু ?"

"কার আর ? আমি আর কার কথা বলবো ? আমার বাপের কুলের ধ্বজা ওই কেনোর কথা বলছি। ছেলেটা যে একেবারে উচ্ছন্ন যাচ্ছে !"

মাষ্টারমশাই ঈষৎ অবাক্ হয়ে বলেন "কানুর কথা বলছো ? আমাদের কানুব ? কেন, কানুতো খুব খাসা ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে। ক্লাশের মধ্যে ফার্ষ্ট বয় ।"

রাসমণি আক্ষেপ করে বলে "কেলাসে ফাষ্টো হয়ে আর আমার পরকালে কি সাক্ষী দেবে ? এদিকে যে সব্বোনেশে বুদ্ধি হয়েছে।"

যেন রাসমণির পরকালে সাক্ষ্য দেওয়াই কানুর পরম কর্ত্তব্য।

মাষ্টারমশাই অবাক্ হয়ে বলেন "কেন বলোতো রাসু ? হঠাৎ কি করলো সে ?"

"হঠাৎ কি চাটুয্যে কাকা, অনবরতই তো যা খুসি করছে ! অবাধ্যর একশেষ, গুরুলঘু জ্ঞান নেই, বাপ-কাকার মুখের ওপর চোপা ! একদণ্ড বাড়ীতে টিকি দেখবার জো নেই। এই গ্রীষ্মের দুপুরে পথে বেরোলে গায়ে ফোস্কা পড়ে, আর ওই ছেলে পাড়াগাঁয়ের চাষা-ভূষোর ছেলের মতন টো টো করে বেড়াচ্ছে—কোথায় কুমোরপাড়ায় পুতুল গড়া দেখতে, কোথায় জেলেপাড়ায় জাল বোনা দেখতে, বারণ করলেই বলে—'বেশ করবো, খুব করবো, আবার যাবো-'"

এই দীর্ঘ ফিরিস্তির মাঝখানে রাসমণি বোধকরি একবার দম নেবার জন্যেই থামে।

সেই অবসরে শিবনাথ মৃদু হেসে বলেন "ছেলে বুদ্ধি, সেরে যাবে এরপর।"

"তাইতো ভাবতাম চাটুয্যে কাকা, কিন্তু আজকে যে বড়ো ভয় ধরিয়ে দিয়েছে! ওর কথা শুনে 'থ' হয়ে গেছি একেবারে! বলে কিনা 'ঠাকুরটাকুর সব মিথ্যে, পেসাদ খাবো না, শিন্নিতে পা ঠেকাবো'— দুর্গা! দুর্গা! অপরাধ নিও না সত্যপীর!"

মাষ্টারমশাই এতক্ষণ রাসমণির নালিশে বিশেষ কর্ণপাত করেন নি, নালিশের শেষ অংশে সচকিত হয়ে ওঠেন। গম্ভীর ভাবে বলেন "তাই নাকি?"।

"তবে আর বলছি কি!"

"কিন্তু হঠাৎ এরকম হলো কেন বলোতো?"

"পাকামী বাড়ছে আর কি! হয়তো কোথাও বদসঙ্গে মিশছে--"

"না না তা হতেই পারে না—" মাষ্টার মশাই নিশ্চিত বিশ্বাসের সুরে বলেন "ও কথা নয়! আচ্ছা তুমি একবার তাকে ডেকে দাও তো আমার কাছে।"

"সে কি আর এখনও এখানে আছে? আমার কাছে গালমন্দ খেয়ে ঠিকরে বেরিয়ে গেলো।"

"আহা হা গালমন্দ কেন, গালমন্দ কেন?" শিবনাথ দুঃখিতভাবে বলেন "ছেলেপুলেকে গালমন্দ করা ভারী খারাপ অভ্যাস রাসু!"

"কি যে বলেন চাটুয্যে কাকা--" অবোধ বালকের অজ্ঞতায় বিজ্ঞরা যেমন হাসে, তেমনি হাসি হেসে রাসমণি বলে "শাসন না করলে কখনো ছেলে মানুষ করা যায়? কথায় বলে 'গালাগালিতে ভূত ছাড়ে!'

"ছাড়েনা রাসু, বেড়েই যায়। অহেতুক গালমন্দে দুর্বুদ্ধির ভূত আরো ঘাড়ে চেপে বসে।"

"চাটুয্যে কাকার এক কথা!" রাসমণি অপ্রত্যয়ের সুরে বলে "আদিঅন্তকাল ওই করেই ছেলে শাসন করে আসছে লোকে। শুধু গালমন্দেই সায়েস্তা হয় নাকি? প্রহারই হচ্ছে আসল অষুধ! শুনতে

পাই আমার ঠাকুর্দ্দা এমন ছেলে ঠেঙাতেন, যে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যেতো!"

শিবনাথ ক্লিষ্টস্বরে বলেন "থাক্ রাসু, ওসব কথা থাক্। তুমি বরং কাল সকালে একবার কানুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমার মনে নিচ্ছে তোমাদের কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে।"

কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে কি না, সে সন্ধান কে নেয়? প্রত্যেকেই জানে আমি নির্ভুল!

তাই নিজের হিসেবে কানুকে শাসন করে কানুর কাকা নানু মিস্ত্রির। ছেলেকে মাটিতে ফেলে তার ওপর কিলচড় বৃষ্টি করতে করতে বলে "বল আর বলবি ও কথা? বল ফের মুখে আনবি?"

আর কানু দম বন্ধ হয়ে আসা গলায় বলে চলে "হ্যাঁ বলবো, বেশ করবো, হাজার বার বলবো। ঠাকুরটাকুর কিছু নেই। মা চণ্ডীর গায়ে ইট ছুঁড়তে পারি আমি।"

"কী বললি? কী বললি? জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে কুকুরকে খাওয়াব, তা জানিস! আজ তোকে খুন করে ফাঁসি যাবো আমি।" হাত ছেড়ে এবার পায়ের সাহায্য নেয় নানুমিস্ত্রিব।

কানু এই আক্রমণ থেকে ঝেড়ে ওঠবার ব্যর্থ চেষ্টায় লুটোতে থাকে, আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে "যাও, যাও, তাই যাও! তুমি ফাঁসি যাবে জানলে আমি মরেও হরিরলুট দেবো।"

অনুকরণপ্রিয় মানুষ! জন্মাবধি যা শুনে আসছে তাই শিখেছে।

নানুমিস্ত্রির ক্ষেপে উঠেছে। কমলার সাধ্য নেই এ কোপ থেকে ছেলেকে রক্ষা করে। সে চোখ বুজে শুয়ে পড়েছে রান্নাঘরে।

রাসমণিও নিজের হাতে জ্বালা আগুনের বহরে এখন নিজেই কাঁপছে। তবু সাহস করে বলে "ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! শেষে সত্যিই হাতে দড়ি পড়বে!"

"পড়ুক!" বাঘের মত গর্জ্জন করতে থাকে হাড়জিরজিরে নান্নু মিস্তির। নিজেরা আশৈশব অমানুষিক শাসনে মানুষ, সেই শাসনের ভয়ে গুরুজনদের ভয় করতো যমের মতো। কানুর এই নির্ভীকতা ওর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! "পড়ুক হাতে দড়ি, আজ হয় ওকে মাপ চাওয়াবো, নয় খুন করে ফেলবো, এই নান্নুমিস্তিরের শেষ কথা।"

"মাপ চাইবো? মাপ চাইবো?" মার খেয়ে খেয়ে গলা বুজে এসেছে কানুর। হাত পা অবসন্ন হয়ে আসছে, তবু বিদ্রোহের কণ্ঠে ঘোষণা করছে "মাপ চাইবো? মরে গেলেও না। আবার বলবো, খালি খালি বলবো, মা চণ্ডী একটা পাথরের ঢিপি! ঠাকুরটাকুর কিচ্ছু নেই। পূজো করে করে তোমরা ভারী ভালো হয়েছো যে! যে ঠাকুরের তোমাদের মতন ভক্ত, আমি সে ঠাকুরের গায়ে থুতু দিই।"

আশৈশবের পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ যেন আজ এই একটা পথে মুক্তি পেতে চায়। তাই ক্ষ্যাপার মতোই আচরণ করতে থাকে কানু।

মেরে মেরে নান্নু মিস্তিরের হাত পা ব্যথা হয়ে উঠেছে, তা'র ওপর আর এতো বড়ো অপরাধের উপযুক্ত মোহাড়া নেওয়া চলে না। তাই সেও বুনোমোষের মতো এদিক ওদিক তাকাতে থাকে মারবার উপযুক্ত একটা কাঠ-কুটোর আশায়। অবশ্য বিনা বাক্যব্যয়ে নয়, চেঁচাতে চেঁচাতেই। যদিও হাঁপাচ্ছে সেও কম নয়।

"দিদি, বলে দাও তোমাদের নতুনবৌকে, আজ যেন তিনি পুত্র শোকের জন্যে প্রস্তুত থাকেন! কেনোকে চণ্ডীতলায় রেখে এসে তবে আমি জলগ্রহণ—" এতোবড়ো একটা মহান প্রতিজ্ঞার মাঝখানেই ঝট্ করে প্রতিজ্ঞাটা গিলে ফেলে বীর নান্নু মিস্তির! রাসমণিও স্তব্ধ!

বেড়ার দরজা ঠেলে সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন শিবনাথ মাষ্টার।

পিছনে প্রায়বোরুদ্যমানা ফুলি।

ভূতগ্রস্ত কানুকে আর একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করবার জন্যে বাড়ীর কাজ কর্ম্মের শেষে একটু আগে এ বাড়ীতে আসছিলো ফুলি,

আর হাতে করে এনেছিলো একটু প্রসাদী নির্মাল্য! ভেবেছিলো লুকিয়ে অন্ততঃ ওর মাথায় একটু ঠেকিয়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু উঠোনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েই নিজেই ভূতাহতের মতো ছুটে পালিয়েছিলো। ছুটতে ছুটতে গিয়ে কেঁদে পড়ে বলেছে—"ও দাদু! শীগগির চলো, কানুদাকে ওরা মেরে ফেলছে।"

"মেরে ফেলছে!"

"হ্যাঁ দাদু, নানুমামা মেরে মেরে একেবারে শেষ করে ফেলছে কানুদাকে।"

মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন শিবনাথ।

দ্বিধা করেননি।

"এটা কি হচ্ছে নলিনী?"

শান্তভাবে প্রশ্ন করেন মাষ্টার। নানু মিত্তিরের পোষাকী নাম নলিনী। সেও একসময় শিবনাথ মাষ্টারের ছাত্র ছিলো, কাজেই এহেন সঙ্গীন মুহূর্তে মাষ্টার মশাইয়ের আবির্ভাবে ঈষৎ কুন্ঠিত না হয়ে পারে না। নিজের দোষ ঢাকার সুরে নানু হাঁপাতে হাঁপাতে বলে "ছেলেটা একেবারে বদ হয়ে গেছে বুঝলেন মাষ্টারমশাই!"

"ও একেবারে বদ হয়ে যায়নি নলিনী, বদ করে তুলেছো তোমরা।"

"আমরা! বদ করে তুলেছি আমরা? ওকে একটু সভ্যভব্য বাধ্য করবার জন্যে বুঝলেন—চেষ্টার কোন কসুর রাখিনি।"

"চেষ্টা—!" শিবনাথ মাষ্টার গম্ভীর হাস্যে বলেন "তোমাদের চেষ্টার পদ্ধতি তো এই? পদ্ধতিটা ভুল, বুঝলে নলিনী!"

এতো সহজে নিজের পদ্ধতির ভুল মেনে নেবে, নানুমিত্তির অবশ্য এতো কাঁচাছেলে নয়। তাই আরো উত্তেজিত স্বরে বলে "কি বলবো, আপনি তো জানেন না ছেলেটি কী চীজ। ক্লাশে ভালো নম্বর পায়, তাতেই মনে করেন খুব ভালো ছেলে।"

শিবনাথ মাষ্টার বাধা দিয়ে বলেন "থাক্ নলিনী, আমি কি মনে করি না করি, সেটা আর তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না। ক্লাশে ভালো

নম্বর তো মনে হচ্ছে যেন তুমিও পেতে! তাই না? সে যাক্। একটি অনুরোধ তোমাকে আর তোমার দাদাকে করবো—"

কি অনুরোধ করতেন শিবনাথ কে জানে, কিন্তু কথার মাঝখানে হঠাৎ কমলা এসে দাঁড়ালো। এর আগে কোনোদিন মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা কয়নি সে, দরকারও হয়নি। আজ আর না কয়ে পারলো না। পুত্রশোক পাবার আগেই পুত্রের ত্রাণকর্তার মতো যিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারবে কেন সে? মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মৃদু কাতর বচনে বলে কমলা "কাকাবাব, ছেলেটার ভার আপনি নিন। নইলে হতভাগাটা কোনদিন মার খেয়েই মরে যাবে!"

এহেন পরিস্থিতিতে রাসমণি আর স্থির থাকতে পারেনা, বিরক্ত স্বরে বলে "নতুনবৌ, আমাদের কথার মাঝখানে তুমি কেন? যাও ঘরে যাও।"

"থামো রাসু", মাষ্টার মশাই গম্ভীরভাবে বলেন "কথাটা তোমাদের নয়, ওঁরই। কারণ উনি কানুর মা।...কিন্তু বৌমা, আমি কি ভাবে ওর—"

"আপনি ওকে নিয়ে যান কাকাবাবু, নিয়ে যান!" কমলা আর্তনাদের মতো বলে ওঠে, "আপনার বাড়ীতে তো অনেক অনাথ ছেলে প্রতিপালিত হয়, তাই মনে করেই ওকে একটু ঠাঁই দিন। আর সহ্য হচ্ছেনা আমার।"

কমলা যে হঠাৎ এরকম কাণ্ড করে বসবে, নান্টু বা রাসমণি কেউ ধারণাই করতে পারেনি, তাই তারা যেন একটু থতমত খেয়ে গেছে। কানু তখনো উঠবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি বলেই চোখবুজে পড়ে আছে। ফুলি তো পাথর!

শিবনাথ মাষ্টার অবশ্য কমলার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না, তবু এই কাতরতা ওর হৃদয় স্পর্শ করে। আপাততঃ হিসেবে কানুর কাছে এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে ওর একটা হাত ধরে তুলে বলেন "কানু

ওঠো। চলো আমার সঙ্গে। আজ থেকে তোমায় ভালো হতে হবে। বুঝলে তো? সত্যিকার ভালো!"

কিন্তু সত্যিকার ভালো হবার সুযোগ ক'জনার জীবনে আসে? পরিবেশ পরিস্থিতি অবিরতই মানুষকে ভাঙছে চুরছে, ধ্বংস করছে, নতুন চেহারায় গড়ছে। মুছে যায় সংকল্পের প্রতিশ্রুতি-লিপি, নষ্ট হয়ে যায় দীর্ঘ সাধনার সুফলটুকু। পরিবেশ পরিস্থিতির দাসত্ব করে করে কুৎসিৎ বিকৃত চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মানুষ।

কানুর জীবনেও ভালো হবার সুযোগ আসেনি।

মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ীতে ক'দিন যেন ছিলো কানু? পাঁচ দিন? তাই হবে বোধহয়। তারপর তো দাশুমিস্তির পুলিশের দারোগাকে এনে ছেলে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো। না যাবে কেন? সেই রাত্রেই যখন বাড়ী এসে সব ঘটনা শুনে ছেলেকে ডাকতে গিয়েছিলো. কানু যে কিছুতেই আসতে চায়নি। বাপের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলেনি।

আর শিবনাথ মাষ্টার বলেছিলেন "থাক্ না দাশরথী, টানা-হেঁচড়া করছো কেন? এখানে না হয় থাকলোই দু'দিন? ছেলেমানুষ, রাগ-অভিমান হয়েছে, দু'দিন পরে কমে গেলে আপনিই যাবে। তোমার বাড়ী আমার বাড়ী আলাদা তো নয়!"

অতএব দাশুমিস্তিরকে চলে আসতে হয়েছিলো। কিন্তু নান্নু মিস্তির আর রাসমণি এতো অপমান নীরবে মেনে নিতে পারেনি। কমলাকে তো তারা যা নয় তাই গালমন্দ করেইছিলো, তার ওপর দাদাকে টিটকিরি দিয়ে বলেছিলো "পরের বাড়ী থেকে নিজের ছেলেকে উদ্ধার করে আনবার ক্ষমতা যার না থাকে, তার বনবাস করাই ভালো। বুঝেছি, শিবনাথ মাষ্টারের অনাথ আশ্রমে ছেলেটাকে ভর্ত্তি করে দেওয়ায় তোমারও সায় আছে। নি-খরচায় ছেলে মানুষ হয়ে যাক, এই ইচ্ছে। তা' নইলে নতুন বৌয়ের সাধ্য কি যে আমাদের মুখের

ওপর এতো বড়ো কথা বলে? আমরা হ'লে একখুনি থানা-পুলিশ করে ছেলে বের করে আনতাম।"

তার পরেও থানা-পুলিশ করবে না, দাশুমিস্ত্রির এতো ঠাণ্ডা-রক্ত মানুষ নয়।

পাঁচটি দিন!

কি সুন্দর সেই দিনগুলি!

পৃথিবীতে যে শান্তি আছে, জীবনে আনন্দ আছে, এ বিশ্বাস যেন ফিরে এসেছিলো। ভোরে ঘুম ভেঙেছে—রাসমণি আর কমলার ঝগড়ার শব্দে নয়, ভেঙেছে মাষ্টারমশাইয়ের গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের গীতা-পাঠের ধ্বনিতে। মানে বোঝবার সাধ্য কিছু নেই। কিন্তু ধ্বনিটা যেন প্রাণের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে!

হ্যাঁ, এমন পরিবেশে ভালো হবার বাসনাই প্রাণে জাগে। সেই পাখী-ডাকা ভোরে, সেই ছায়া-ঢাকা উঠোনের এক কোণে এসে পড়া না-ওঠা সূর্য্যের অরুণ আভার দিকে চোখ মেলে মনে হয়েছিলো কানুর, ভালো হবে। সত্যিকার ভালো!

কিন্তু সত্যিকার ভালো হতে হ'লে যে কি হতে হয়, কি করতে হয়, সে কথা কে কবে বলেছে কানুকে? কানুর অভিভাবকরাই বা কবে শিখেছে সে কথা?

শিবনাথ মাষ্টার চেয়েছিলেন বলতে, কিন্তু তিনি আর তার সময় পেলেন কই?

মায়ের ব্যথা মিটে বিছানা থেকে উঠতেই তো পাঁচ দিন লেগেছিলো কানুর। তারপরই দাশুমিস্ত্রিরের হামলা!

তবু জীবনে সেই পাঁচটি দিন বড়ো উজ্জ্বল, বড়ো মিষ্টি!

ওরই মধ্যে একদিন কানুকে নিজের মহিমা দেখাতে মোচারঘণ্ট রেঁধেছিলো নন্দ। বাড়ীর কলাগাছের মোচা। হি, হি, হি, সে কথা মনে করতে গেলে এই দু'যুগ পরেও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

হি-হি-হি !

হেসে পিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়েছে ফুলি। "ও নন্দদা, এ কি রেঁধেছো গো? মোচারঘণ্ট, না সোজাসুজি একেবারে কলাগাছেরই ঘণ্ট? ও কানুদা, দেখো দেখো একবার খেয়ে দেখো! জীবনে আর ভুলতে পারবে না। সত্যি বাপু, আমাদের নন্দদার রান্না বটে একখানা! জন্মের মতন খাবার বাসনা ঘুচিয়ে দেওয়া রান্না! নন্দদা, তোমার সেই বিখ্যাত আমের চাট্‌নিটা একবার খাইয়ে দিও না কানুদাকে!"

ঝরণার মতো হাসি!

মেদিনীপুরের ছেলে নন্দ। তার কথায় টান, মেজাজে রাগ। ক্লান্তমুখ নেড়ে সে উত্তর দিয়েছে "ওঃ ভারী আমার পাকা রাঁধুনী এলেন! বলি নন্দটা কি হয়েছে? নন্দটা কি হয়েছে? ঘণ্ট আবার কেমন হয়?"

ফুলির হাসি আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে "ওমা কি আশ্চয্যি কথা নন্দদা, মোচারঘট যে 'নিম-বেগুনে'র মতো হয়, তাও জানো না? এ যে মোটে উচ্ছের ঝালের মতো হয়েছে গো! আর একটু তেতো হবে, তবে না মোচার ঘণ্ট? কি বলো কানুদা? তাই না?"

নন্দর ভাতের মাপটা একটু বেশী।

সে একটু একটু ঘট মেখে এক এক থাবা ভাত মুখে পুরতে পুরতে ভরা মুখে বলে "এই তো আমি খাচ্ছি, কি হচ্ছে কি?"

"আহা হবে আবার কি? তোমার বুঝি আশা ছিলো নন্দদা, তোমার মোচারঘণ্ট খেয়ে আমাদের সবাইয়ের কপালের ওপর ফুটো করে শিঙ্‌ গজাবে?"

ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী ঠাট্টা!

কিন্তু এই হাসির আলোয় কী অদ্ভুত লাবণ্য ফুটে উঠেছিলো ফুলির মুখে! কানু অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছিলো—ফুলিটা এতো

হাসতে পারে কি করে? এতো প্রফুল্লতা, এতো প্রসন্নতা কোথায় পায় ও?

আর বেচারা নন্দ রাগ ভুলে হাঁ করে তাকিয়েই ছিলো সেই মুখের দিকে।

মার খেয়ে রক্ত ফুটে উঠেছিলো পিঠে, লাল লাল ছড়া ছড়া দাগ। নারকেল তেল গরম করে পিছন পিছন ছুটছে ফুলি, ব্যথা সারিয়ে দেবে।

কানুও দিতে দেবে না, ফুলিও ছাড়বে না।

শেষ অবধি ফুলিরই জিত!

"ইস্ আহা-হা!" ফুলির মুখে করুণার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা দুষ্টু হাসি ফুটে ওঠে। "আহাহা দেখে দুঃখু হচ্ছে! তবু—যাই বলো কানুদা, ভাগ্যিস নানুমামা এই কাণ্ডটি করেছিলেন!"

ভাগ্যিস!

কানু চোখ মুখ কুঁচকে বলে "ভাগ্যিস মানে? আমার এই দুর্গতিতে খুব তা'হলে ফুর্ত্তি হয়েছে তোর?"

"আহা তা নয়, মানে—বুঝতে পারছো না? এই রাম বেধড়ক প্রহারটি না দিলে তো আর তোমার আমাদের বাড়ীতে এসে থাকা হতো না?"

"ওঃ! এই কথা!" মুখের রেখা মসৃণ হয়ে গেছে কানুর, "তা যা বলেছিস—" বলে দু'জনেই হাসতে সুরু করেছে হো-হো করে।

"নতুন মামীমা যদি এখানে এসে থাকেন, তা'হলেই সব শান্তি হয়ে যায়, না কানুদা?"

"নতুন মামীমা? ওঃ না?" কানুর ভুরু ফের কুঁচকে ওঠে "কেন? কিসের জন্যে?"

"আহা যতই হোক, মার জন্যে তো তোমার মন কেমন করছে—"

"কক্ষনো না! পৃথিবীতে কারুর জন্যেই আমার মন কেমন করে না।" কানু সগর্ব্বে ঘোষণা করে।

পৃথিবীতে কারুর জন্যেই না !

ফুলির মুখটা যেন মলিন হয়ে আসে। তবু গিন্নীর ভঙ্গীতে বলে "ও তোমার রাগের কথা কানুদা, মায়ের তুল্য জিনিস কি আর জগতে আছে ? এই যে আমার দেখোনা, মা নেই বলেই না —"

"মা নেই বলেই বেশ আছিস, ভালো আছিস, খুসিসে আছিস ! আমারও না থাকলে বাঁচতাম ! মা-পিসি, বাবা-কাকা কেউ যদি না থাকতো তা'হলেই ভালো ছিলো আমার। আমায় কেউ ভালবাসে না। আমিও কাউকে ভালবাসি না।"

কথাটা বলে দালানের এদিক থেকে ওদিক অবধি জোরে জোরে পায়চারী করে কানু।

ফুলির বুকটা ধক্ ধক্ করে ওঠে।

মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়। এসব কী ভয়ানক ভয়ানক কথা বলছে কানুদা ! যে কথা মনে আনাও পাপ, মনে আনার কথা কেউ ভাবতে পারে না, সে কথা কানুদা এতো সহজে মুখে আনছে ! কেন এমন ভয়ঙ্কর মনোভাব ওর ?

এতো ভালো লাগে কানুদাকে, কিন্তু এক এক সময় কেন এতো ভীতিকর ও ? ওর মনের নাগাল পাওয়ার কোনো উপায় নেই যেন।

দাশু মামা, নানু মামা, রাসু মাসী, নতুন মামী, সকলকেই তো দেখেছে ফুলি, কিন্তু ওরা এতো কি খারাপ ? কই বোঝা যায় না তো ! নানু মামাটা বড্ডো মোক্ষম মারে সেকথা সত্যি, তবু ওরা সব্বাই মরে গেলে ভালো হতো এমন কথা কখনো ভাবা যায় ? আর কানুদা ওদের নিজেদের ছেলে হয়ে···আশ্চর্য্য ! কমলার জন্যেই বেশী দুঃখ হয় ফুলির। আহা বেচারা রোগা রোগা মানুষটা ! রাসু পিসির জ্বালাতেই ঝগড়াটে হয়ে গেছে। নইলে কি আর এতো খারাপ ? আর যতোই হোক কানুর নিজের মা !

কানুর এই অধঃপতনে ভারী দুঃখ বোধ করে ফুলি। এতে ও নিজেও তো কষ্ট পায়! না-না, ওর এই অকারণ অশান্তি দূর করা দরকার।

"তুমি ওই রকম বলছো কানুদা" ফুলি কোমল স্বরে বলে "কিন্তু নতুন মামীই তো তোমাকে রক্ষা করলেন? তোমায় যদি ভাল না বাসবেন, তা'হলে কেন অমন করে—"

"সে কি আমার জন্যে ভেবেছিস?" কানু উদ্ধত গলায় বলে, "সে শুধু নিজের পুত্রশোকের ভয়ে। বুঝলি? আমার জন্যে কষ্ট হলে অনেক আগেই আটকাতে পারতো! জানি জানি, চিনে নিয়েছি আমি সবাইকে।"

এই রুক্ষ উদ্ধত মূর্ত্তির সামনে আর কথা যোগায়নি ফুলির, ও শুধু ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে-- 'ঠাকুর, কানুদাকে সুমতি দাও।'

খানিক পরেই আবার কানুর অন্য ভাব।

মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ীতেই ওর থাকাটা নিশ্চিত ভেবে মহোৎসাহে উঠোনে মাচা বাঁধতে বসে ঝুমকোলতার গাছ লাগাবে বলে। অবশ্য ফরমাস খাটতে খাটতে ফুলি নাজেহাল হয়ে যায়।

"দড়ি আন, পেরেক আন, ইট সরিয়ে দে, কঞ্চিটা ধরে থাক শক্ত করে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

উৎসাহের জোয়ার আসে ফুলির প্রাণেও।

দেখাদেখি নন্দ এসে হাত লাগায়। দীনেশ, গোবিন্দ আর রামমোহন বলে আরো যে ছেলে তিনটি রয়েছে, তারাও কাজে লেগে যায়।

মাচা বাঁধা যেন এক উৎসবে পরিণত হয়।

আর বাঁধা শেষ হয়ে সবে যখন লতাকুঞ্জের পরিকল্পনা চলছে, ঠিক সেই সময় দাশুমিত্তির ঢুকলেন দারোগাকে নিয়ে।

স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি শিবনাথ মাষ্টার বলেছিলেন "এতোর দরকার ছিলো না দাশরথী, ও আপনিই যেতো। মিথ্যে কতকগুলো হাঙ্গামা পোহালে।"

দাশুমিত্তির সে কথার উত্তর দেয়নি, শুধু তীব্র চীৎকারে বাড়ী মাথায় করে ছেলেকে ডাক দিয়েছিলো "বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় বলছি, পাজী বদমাস শয়তান!"

বেরিয়ে এসেছিলো কানু ঘর থেকে।

বুনো ঘোড়ার মতো ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে বলেছিলো—"আমি যাবো না।"

"যাবি না? যাবি না? বজ্জাত ছেলে!···দারোগাবাবু, দেখছেন কুশিক্ষার ফল? দেখে যাচ্ছেন তো আপনি? এ বাড়ির মালিকের নামে আমি নালিশ করবো আমার ছেলে খারাপ করার জন্যে।"

বলা বাহুল্য দারোগাবাবু বেশ কিছু 'সেলামি' নিয়েই তবে এসে ছিলেন, কাজেই তিনি দাশুমিত্তিরের পক্ষে। তিনি বলেছিলেন "হু।"

"আমি এখানেই থাকবো কিছুতেই যাবোনা। কেটে ফেললেও না" বলেছিলো কানু।

কিন্তু থাকা হয়নি।

শেষ পর্য্যন্ত মাষ্টারমশাই নিজেই বলেছিলেন "কানু, তোমাকে আমি আদেশ করছি তোমার বাবার সঙ্গে যাও।"

চিরদিনের অবিচলিত ধীর স্থির শিবনাথ চাটুয্যের চোখদুটো জ্বালা করে কি জল 'আসি আসি' হয়েছিলো সেদিন? কে জানে!

কানু অতো তাকিয়ে দেখেনি। দেখবার মতো অবস্থাও ছিল না তার। সে অভিমানাহত কণ্ঠে শুধু বলেছিলো সে "তাড়িয়ে দিচ্ছেন?"

শিবনাথ বলেছিলেন "ধরে নাও তাই।"

আর দ্বিরুক্তি করেনি কানু। বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গিয়েছিলো, বোধকরি সমস্ত পৃথিবীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে।

মাষ্টারমশাই যে পুলিশের ভয়েই কানুকে বাড়ীতে থাকতে দিলেন না, এ সম্বন্ধে তার সন্দেহ রইলো না কানুর। "ভালো হবার" যে পবিত্র সংকল্পটুকু একটুখানি নরম করে আনছিলো তাকে, সেটুকু আর রইলো না। সারা পৃথিবীর প্রতি আক্রোশ এলো।

কিন্তু কেন কানুর এই দুরন্ত মানসিক যন্ত্রণা? কানুর অভিভাবকরা অত্যাচারী বলে?

সে কথা বললে মিস্তির বাড়ীর প্রতি অবিচার করা হবে। মফঃস্বলে তখনো যে হাওয়া বইতো সে হাওয়া ঠিক আধুনিক জগতের নয়। ছোটদের 'মানুষ' বলে গণ্য করবার রেওয়াজ তখনো সেখানে পৌঁছয়নি। ছোটদের পক্ষে বড়োদের ইচ্ছার দাস হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য, আর খাওয়া পরা ও স্কুলের মাইনে এই হচ্ছে তাদের ঊর্দ্ধতম পাওনা, এমনি একটা মনোভাব নিয়েই প্রায় সবাই চলতো। কাজেই শুধু দাশুমিস্তিরদের অপরাধী করা চলেনা।

ছেলে মানুষ করা মানেই ছেলে শাসন করা!

আর শাসন পদ্ধতিটাও কমবেশী সকলেরই এক। রমেশ, নীরেন, সত্যশরণ, এরা ওরা তারা, সকলেই এই রকম শাসন যন্ত্রের তলায় পীড়িত। কিন্তু তারা কেউ কানুর মতো উদ্ধত নয়, বিদ্রোহী নয়। তারা চোখরাঙানীতে 'কেঁচো' মুর্ত্তি ধরে, কাজেই অভিভাবকদের পরিশ্রম কম।

চড়টা চাপড়টা?

একবারের বেশী দু'বার নয়। "আর কক্‌খনো করবোনা" এ বুলি তাদের মুখস্থ যে!

কানু জীবনে উচ্চারণ করেনি ও কথা।

কাজেই কানুর অভিভাবকদের পরিশ্রমের অন্ত নেই। কানুকেও যদি একবার মেরে দু'বার মারতে না হতো, তা হলে দাশুমিস্তিরও হয়তো নীরেনের বাপের মতন চটি পেটানোর পরই চারটে পয়সা হাতে দিয়ে বলতো "যা ঘুড়ি কিনগে যা।"

নীরেনের যেদিন ঘুড়ি লাট্টুর পয়সার অভাব হয়, ও সেদিন ইচ্ছে করে বাপের অপ্রীতিকর কোন কাজ করে বসে, একথা নিজে মুখেই গল্প করেছে পরম আনন্দে। ওর দিকেও অবশ্য যুক্তি আছে, "মার তো গায়ে লেগে থাকবেনা, লাট্টুটা থেকেই যাবে।"

কিন্তু কানুর কাছে তো বালকমনের এই সহজ হিসেব নেই। কানু ছোটদের প্রতি বড়োদের এই সহজাত অধিকারকে অবিচার বলে গণ্য করে, আর সেই অবিচারের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণা।

বড়োদের প্রাণের স্নেহ মমতা করুণাকে ঘৃণা করে সে, দস্তুরমতো ঘৃণা করে। একমাত্র ফুলির কাছেই মাঝে মাঝে সে তার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেছে, আর সেই উদ্‌ঘাটনের মুহূর্তে বলেছে কানু যে "হ্যাঁ, বরং পিটনচণ্ডী সহ্য হয় তো আদর সহ্য হয় না। মা যখন আদর করতে আসে, মাকে আমার মারতে ইচ্ছে করে।"

কানুকে কেউ বোঝেনা বলেই হয়তো কানুও কাউকে বুঝতে শেখেনি। হয়তো কানুকে যদি ওরা বুঝতে পারতো, তা'হলে কানুর আত্মা এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো না।

"দাশুমিস্তিরের ছেলের ব্যাপারটা শুনেছো তোমরা? তোমাদের ওই বন্ধু কানুর?" বলেছিলেন রমেশের বাবা, ছেলেদের ডেকে। "ও রকম বদছেলের সঙ্গে তোমরা মেশো এ আমি চাইনা বুঝলে? বংশের মুখ হেঁট করা ছেলে! বুকের পাটা কি! দারোগার মুখের সামনে বলে 'বাপের সঙ্গে যাবোনা'। ছি ছি!"

সত্যশরণের বাড়ীতে তো সকলেই জেনে ফেলেছিলো 'কানু একটা ডাকাত'। পাগলা বাবার মরার দিন থেকে কানুর সঙ্গে তার কথা বন্ধ। তদুপরি তার ওপরও আদেশ জারি হয়ে যায় কানুকে 'বয়কট' করে চলতে।

নীরেন, প্রবোধ, আশু, কেষ্ট—পাড়ার আরো সব ছেলেদের বাড়ী থেকেও তাদের প্রতি অভিভাবকদের এমনি কড়া নির্দ্দেশ জারি হয়ে গেলো।

কানুর সঙ্গে কেউ মিশবে না, কানু খারাপ ছেলে। যে ছেলের জন্যে থানাপুলিশ করতে হয় তার মতন খারাপ ছেলে ভূভারতে আছে নাকি?

অবশ্য বাড়ীতে বাড়ীতে অন্য আলোচনাও চলেছিলো। মাষ্টার-মশাইয়ের প্রশ্রয়েই যে এতো দুঃসাহস বেড়ে গেছে ছেলেটার এটা ঠিক। তুমি বাপু মাষ্টার আছো, আছো। পাড়ার লোক আছো, আছো। তাই ব'লে পরের সংসারে নাক গলাতে যাবার তোমার দরকার কি? কে কার ছেলেকে কি ভাবে শাসন করছে তা দেখবার তোমার কি কাজ? আপনার ছাগল ল্যাজে কাটবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে।

মাষ্টারমশাইয়ের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল হলেও দাশুমিস্ত্রির ছেলের ব্যাপারে অনেকেই যেন বিরূপ হয়ে উঠলো। কারণ ইতিমধ্যে তার ধিঙ্গী নাতনীটার প্রতি অনেকে বিরূপ ছিলো। অতোবড়ো মেয়ে ইচ্ছে মতো হিহি করে হাসে, খেলে, পাড়া বেড়ায়- একি? কানুরই বা সারাদিন ও বাড়িতে যাবার কি দরকার? আবার বাড়ী থেকে চলে গিয়ে থাকতে গেলো ওদের বাড়ী?

না না, এতো খারাপ ছেলের সঙ্গে নিজের ছেলেদের মিশতে দিতে কেউ রাজী নয়।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কানু স্কুলে এসে দেখলো সে 'একঘরে'। সহপাঠিরা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচাচ্ছে "বয়কট বয়কট! কানু বয়কট!"

বয়কট!

কথাটার মধ্যে কি দুরন্ত জ্বালা !

কানুর মনে হতে লাগলো ওরা যেন খানিকটা তরল আগুন নিয়ে কানুর গায়ে লেপে দিচ্ছে।

তবু কাউকে কিছু বললো না সে।

মাষ্টার মশাইদের কাছে গিয়ে নালিশ জানাবে এমন পাত্র কানু নয়। একলা একলাই মনের আগুনে পুড়তে লাগলো বেচারা।

আর কারো চোখে পড়েনি, চোখে পড়েছিলো শিবনাথ মাষ্টারের। সেই গোলমালের দিনের পর থেকে কানুকে তিনি বড়ো একটা দেখতে পাননি, স্কুলে দেখলেও কথাবার্তা হয়নি। ডেকে কথা বলতে তাঁর নিজেরই কেমন লজ্জা করছিলো। আজ বললেন। টিফিনের সময় কানু পিছনের মাঠে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, মাষ্টারমশাই এসে বললেন "তুমি এখানে একা যে কানু ?"

কানু মুখ তুলে একবার তাকালো।

হাতে একটা ঘাস ছিলো সেটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো "এমনি।"

"ওরা বুঝি তোমার সঙ্গে খেলা করছে না ?"

গম্ভীর হাস্যে বললেন শিবনাথ।

বলা বাহুল্য কানু নীরব।

"ঝগড়া হয়েছে ?"

কানু লাল লাল ভিজে ভিজে চোখ দুটো তুলে তীব্রস্বরে বললো "না।"

"আচ্ছা আমি ওদের ডেকে বকে দিচ্ছি।"

"না না, কক্‌খনো না—" কানু আরো তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে "আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না। সবাইকে চিনে নিয়েছি আমি।" জোরে জোরে ঘাসটাকে আরো টুকরো করতে লাগলো কানু।

শিবনাথ আবার হাসলেন।

"চিনে নিয়েছো, সে তো ভালোই। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে হবে তো?"

"কেন হবে? থাকবো না আমি। দরকার নেই আমার কারো সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবার। আমি পাজী, আমি খারাপ, আমি ছাই, আমি জন্তু, আমি জানোয়ার, আমি মরে যাবো।" বলেই হঠাৎ পাগলের মতো ছুটতে সুরু করলো কানু স্কুল-কম্পাউণ্ডের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে।

শিবনাথ মাষ্টার কেমন যেন স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে থাকলেন, বাধা দিতে পারলেন না।

শিবনাথ মাষ্টারকেও কেউ বাধা দিয়ে আটকাতে পারেনি। সেই দিনই তিনি স্কুল-কমিটির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, তিনি স্কুলের কাজ থেকে মুক্তি চান।

দরখাস্ত দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ তো নিজেদের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারেননি। শিবনাথ মাষ্টার ছাড়বেন 'বঙ্গভারতী হাই স্কুল'!

বঙ্গভারতী হাই স্কুলের প্রত্যেকটি বেঞ্চ, টেবিলও যে শিবনাথ মাষ্টারের সন্তানতুল্য প্রিয়। মরবার দিন পর্য্যন্ত উনি স্কুলে আসবেন এই ছিলো সাধারণ সকলের ধারণা।

এ স্কুলের গোড়াপত্তন থেকে শিবনাথ আছেন। কতো মাষ্টার এলো গেলো, স্কুল কমিটির কতো রদ্‌বদল হলো, শিবনাথ ঠিক আছেন টিঁকে।

আর আজ হঠাৎ কারো সঙ্গে কোনো মতান্তর হয়নি, কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি, শান্ত স্থির পরিবেশের মাঝখান থেকে শিবনাথ হঠাৎ চাকরীর দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইছেন, এর মানে কি?

কর্তারা 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এলেন, কতো প্রশ্ন, কতো অনুনয় বিনয়! শিবনাথ আপন প্রতিজ্ঞায় অটল। তাঁর শুধু একটি কথা—"আর পারছি না।"

"পারছেন না? শরীর খারাপ? বেশ তো ছুটি নিন?"

না, শরীরে কিছু হয়নি শিবনাথের।

শরীরে কিছু হয়নি অথচ 'পারছিনা'—এ কেমন কথা ?

ওই কথা।

ছুটি চাই ! ছুটি চাই !

শিবনাথ মাষ্টারের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ছুটির জন্য।

অনেক অনুনয়ের পর অবশেষে সেক্রেটারী মশাই রেগেই উঠলেন। বললেন, "বিনা কারণে হঠাৎ এভাবে কাজ ছাড়া সন্দেহজনক। এতে স্কুলের বদনাম হতে পারে, অনেকে হয়তো মনে করতে পারে আমি আপনাকে ছাড়তে বাধ্য করেছি। আপনাকে স্কুল ছাড়ার কারণ দর্শাতে হবে। লিখুন তা'হলে—'শারীরিক অসুস্থতার জন্য—"

শিবনাথ বাধা দিয়ে বললেন, "বললাম তো শরীর খুব সুস্থ আছে আমার—"

"তা'হলে ? একটা কিছু বলবেন তো—"

প্রায় বকে ওঠেন সেক্রেটারী।

"আচ্ছা ! বলছি।"

শিবনাথ টেবিল থেকে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন "শিক্ষকতা আমার জীবনের ব্রত ছিল, "বঙ্গভারতী হাই স্কুলে" দীর্ঘকাল সে কাজ করিয়াছি, কিন্তু এখন বিবেচনা করিতেছি যে, শিক্ষকতা করিবার অধিকার আমার ছিল না। দীর্ঘকাল যাবৎ একটি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনে বসিয়া 'শিক্ষকতা'রূপ খেলা করিয়া আসার জন্য আমি লজ্জিত। সে কারণ আমি আজ " ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবাক হয়ে সকলে ভাবলো, বয়েস হয়ে মাথাটা বিগড়ে গেলো নাকি শিবনাথ মাষ্টারের ? কেউ কোনো কারণ বুঝতে পারলো না।

আর—একটু একটু কারণ যারা বুঝতে পারছিলো, তারা ভয়ে চুপচাপ রইলো। কারণ তারাই হয়তো 'কারণ'। শিবনাথ মাষ্টারের ছাত্রবৃন্দ।

কানু দৌড় মারবার পর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাশে এলেন মাষ্টারমশাই। অভিমানাহত কানুর যন্ত্রণা তিনি নিজের ভিতরে অনুভব করছিলেন। ক্লাশে এসে ছাত্রদের ডেকে প্রথম বললেন, "শোনো, তোমরা তোমাদের একজন সহপাঠির দুঃখের কারণ হয়েছো, এটা ভারী লজ্জার কথা। কানুর সঙ্গে তোমরা কথা বলছো না, খেলছো না—এতে সে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছে।"

ক্লাশসুদ্ধ ছেলেই অবশ্য নীরব।

তবে দু' চারজন উস্‌খুস্‌ করছিল উত্তর দেবার জন্য। মাষ্টারমশাই আর একবার সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন, "সে তোমাদের বন্ধু। তোমাদের উচিত হয় না তার মনে কষ্ট দেওয়া। তোমরা ছাত্র, সব থেকে পবিত্র আর মহৎ এই জীবন! পরস্পর পরস্পরকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে যদি না দেখতে পারো তোমবা, তার চাইতে নিন্দনীয় আর কিছুই নেই। জীবনের পরম শ্রেষ্ঠ কাল বাল্যকাল, পরম শ্রেষ্ঠ জীবন ছাত্রজীবন, এসময় তোমরা নিজেদেরকে মানুষ করে তোলবার সাধনায় ডুবে থাকবে। হিংসা-দ্বেষ, রেষারেষি, নীচতা, এসব কেন? কানু বেচারা আজ পালিয়েছে, কাল থেকে তোমরা ওর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে।"

হঠাৎ একটা বেঞ্চের তলা থেকে কে যেন বলে উঠলো, "না না না।" সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হৈ-চৈ করে উঠলো– "না না না।"

কোন ফাঁকে সত্যশরণ বেঞ্চ থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে বেঞ্চের তলায় বসেছিলো, আর ঝুলন্ত পা'গুলোতে চিম্‌টি কাটছিলো। এখন যেন বাজনার ধূয়ো ধরলো—"না না না।"

মাষ্টারমশাই অবাক হয়ে বললেন "কেন, তার দোষটা কি?"

"একশো হাজার দোষ! সে পাজী, ভীষণ পাজী!"

শিবনাথ মাষ্টারের ক্লাশে এরকম গোলমাল বোধকরি এই প্রথম।

মাষ্টারমশাই বিরক্তভাবে বললেন "সভ্য ভাষায় কথা বলতে শেখো। তার দোষটা কি না বলে তাকে খারাপ বলছো কেন?"

"দোষ-টোষ জানিনা স্যার—" ছেলেদের গলায় যেন বেপরোয়ার সুর—"বাড়ীতে বারণ করে দিয়েছে ওর সঙ্গে মিশতে।"

শিবনাথ মাষ্টার দৃঢ়ভাবে বলেন "সকলে মিলে একজনের বিরুদ্ধে লাগা হচ্ছে নিষ্ঠুরতার চরম, এতে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। বাড়ীতে বোলো আমি বলেছি কথা বলতে।"

"হবেনা স্যার! বাড়ীতে মেরে ফেলবে। আপনার কথা শুনতে গিয়ে মরতে পারিনে তো স্যার! কেনোর সঙ্গে আমরা কেউ কথা বলবো না।"

শান্তশিষ্ট দেখতে ছেলেগুলোর ভিতরের বর্ব্বরটা বেরিয়ে পড়েছে।

শিবনাথ মাষ্টারেরও হঠাৎ কেমন রোখ চেপে গেছে। তাঁর কপালের শির ফুলে ওঠে, চোখ জ্বালা করতে থাকে, প্রায় ধমকের সুরে বলেন তিনি "আমার আদেশ হচ্ছে তোমরা তোমাদের একজন সহপাঠির সঙ্গে কথা বন্ধ রাখবে না। কথা বলবে।"

"বলবো না। বলবো না।"

"তোমরা যদি এরকম অসভ্যতা করো, আমি আর তোমাদের পড়াবো না।"

মাষ্টারমশাই বুঝি মোক্ষম চাল দেন।

কিন্তু ছেলেগুলো আজ যেন দুঃসাহসের বর পেয়েছে, তাই বলে ওঠে—"না পড়াবেন না পড়াবেন, তাই বলে কি নিজের বাপ মার অবাধ্য হবো? তাই বুঝি চাইছেন? বেশ তো আপনার শিক্ষা স্যার!"

শিবনাথ মাষ্টারের সামনে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেছে, যেন সে আগুনে তাঁর সর্ব্বস্ব পুড়তে বসেছে, অথচ তাঁর হাত পা বাঁধা। হাত পা বাঁধার মতো নিরুপায় দৃষ্টিতে তিনি এই কোলাহলপরায়ণ ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, নেহাৎ অবোধ

শিশু কেউ নয়, চৌদ্দ পনেরো ষোলোর মতো বয়েস। ক্লাশে ফেল করা সতেরো আঠারোর গাধাও আছে দু'একটা।

কারো গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, কারো গলার স্বর মোটা হয়ে গেছে, এদের এই দুর্বিনয়কে ছেলেমানুষী বলে ওড়ান চলেনা।

হঠাৎ নিজের অভ্যাসেব বিপরীত স্বরে ধমক দিয়ে উঠলেন শিবনাথ মাষ্টার, "বেরিয়ে যাও আমার ক্লাশ থেকে।"

গোটাকতক ছেলে বাদে, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত ছেলে হৈ হৈ করে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

মাষ্টারমশাই যেন দিশেহারা হয়ে গেছেন, বুঝতে পারছেন না হঠাৎ কোথায় কি ঘটলো! তাঁর শিক্ষক জীবনে ছাত্রদের এরকম অসৌজন্য এই প্রথম।

কিন্তু কেন? সকলে একসঙ্গে এ রকম কেন?

বোধকরি বর্ব্বরতার একটা নেশা আছে। একজনেব মধ্যে তার প্রকাশ দেখলেই অপরজনের সেই ইচ্ছে জেগে ওঠে। আর এই বর্ব্বরতার শিক্ষা পেয়েছে তারা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকেই।

শিবনাথ একবার ভাবলেন, যে ক'টা ছেলে বসে আছে যথানিয়মে তাদেরই পড়িয়ে যাবেন, পারলেন না। হাত পা কাঁপছে, গলাব স্বর বসে গেছে। হাতের ইসারায় ওদের চলে যেতে বললেন। ওরা চলে গেলো। উনি বসে রইলেন একটুখানি। তারপর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন ক্লাশ থেকে।

মাথাটা সামনের দিকে ঝোঁকা, দু'টো হাত পিছনের দিকে জড়োকরা, যাচ্ছেন সরু প্যাসেজটা দিয়ে, হঠাৎ কি একটা বন্দুকের গুলি এসে বুকে বিঁধলো?

না, সত্যকার বন্দুকের গুলি নয়, কিন্তু তার চাইতেও বুঝি ভয়ানক! কথার গুলি!

কাঠের পার্টিশানের ওপিঠে একটা হি-হি-হি-হি-হাসির সঙ্গে কথার আওয়াজ! "শিবু মাষ্টারকে আজ একেবারে হাড়গোড়ভাঙা 'দ' বানানো

হয়েছে। হি হি হি!" "আচ্ছা কেনোটার ওপর শিবুর এতো দরদ কেন বলতো?"

"জানিস্ না? হি-হি-হি-হি হো-হো-হো-হো—খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্! কেনোই যে শিবুর নাতজামাই!"

না, তবুও অজ্ঞান হয়ে যাননি শিবনাথ, শুধু বোধকরি অসাড় হয়ে গিয়েছিলেন।

সেই অসাড় অবস্থাতেই অফিস ঘরে এলেন, দরখাস্ত লিখলেন, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন বঙ্গভারতী হাইস্কুলের গেট পার হয়ে।

পরের দিন কমিটির দলবল নিয়ে স্বয়ং সেক্রেটারী গিয়ে হানা দিয়েছিলেন মাষ্টারের কাছে, কিন্তু তার ফলাফল তো আগেই বলেছি।

"আমি অসুস্থ নই" ব'লে যতোই বিবৃতি দিন শিবনাথ, ক'দিন পরেই বিছানা নিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রথম আর সেই শেষ।

কিন্তু বেচারা ফুলি আর ক'টা ছোট ছেলে কি ভাবে এতো বড়ো বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো, সে খবর কে রাখে?

দেশসুদ্ধ লোক তখন দাশুমিস্ত্রিরের ছেলের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার মুখরোচক খবরটা নিয়ে মসগুল।

শুধু যুদ্ধে যেদিন হার মানলো ফুলি, সেদিন সবাই সচকিত হয়ে ছুটে এলো। কোমরে গামছা বাঁধলো, ঘী কাঠ জোগাড় করলো, শিবনাথ মাষ্টারের দেহভস্ম চণ্ডীতলার শ্মশানে রেখে ফিরে আসার সময়ে সমস্বরে বলতে লাগলো "একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেলো!" "হ্যাঁ যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে একজন!" "অমন স্বাস্থ্য ছিলো, এতো তাড়াতাড়ি যাবেন, কেউ ভাবেনি কখনো।"

কানু এ সবের কিছুই জানতে পারলো না।

সে তখন দিনের পর দিন—না স্নান, না খাওয়া, এক কাপড় জামায় কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দাশুমিস্ত্রির যে নিরুদ্দেশ ছেলের উদ্দেশে কাগজে কাগজে আবেদন পত্র ছাপিয়েছেন তার মা মৃত্যুশয্যায় ব'লে, আর পাঁচশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে, সে সব কিছুই টের পায়নি কানু।

রাস্তার ছেলেদের মতোই অনেকদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিলো কানু।

কি খেয়েছে ?

ঈশ্বর জানেন !

কি পরেছে ?

সেই এক কাপড় জামা।

রাস্তার কলে ভিজেছে, বৃষ্টির জলে ভিজিয়েছে, গায়েই শুকিয়েছে।

কোথায় শুয়েছে ?

হয়তো ফুটপাথে, হয়তো কারো বাড়ীর দাওয়ায়, হয়তো কারো ঝুল বারান্দার নীচে।

আর শুধু মনে মনে সংকল্প করেছে ওর এই যন্ত্রণার শোধ পৃথিবীকে কি ভাবে দেবে।

অবশেষে একদিন জীবনের মোড় একটু ঘুরলো। আশ্রয় পেলো কানু।

কানুর প্রায় সমবয়সী একটা ছেলে, হয়তো বা মাত্র দু'এক বছরের বড়ো, মোটর চালিয়ে ছুটে আসছিলো উর্দ্ধশ্বাসে, ব্রেক কসতে কসতেও কানুর গায়ে লাগলো একটু ধাক্কার মতো, রাস্তায় পড়ে গেলো কানু।

রাস্তাটা একটু নির্জ্জন নির্জ্জন মতো, তাই সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশজন লোক এসে গাড়ীর চালককে ঘিরে ধরেনি, কানুই ঝেড়েপুড়ে উঠলো। উঠে চোখ রাঙিয়ে রুখে দাঁড়ালো।

কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে, কাউকে গাড়ীচাপা দিলে যে চালকের শাস্তি হয়, সেটা তার জানা হয়ে

গেছে। তার ওপর যখন দেখলো চালক একটি কিশোর মাত্র, সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেল তার।

ওই ছেলেটা, কানুর মতো বয়েস যার, কানুর চাইতে অনেক বিশ্রী আর কালো, সে এরকম ঝকঝকে পোষাক, তকতকে জুতো পরে হাওয়া-গাড়ী চালিয়ে হাওয়ার মতো ভেসে যাবে, আর কানু হতভাগা তার গাড়ীর তলায় পড়ে মরবে?

মরেনি, মরতোই তো এখুনি!

হাত-পা, মুখ ছড়ে কেটে তো গেছেই।

ছেলেটা বুঝি বলেছিলো "লাগেনি তো?"

কানু রুক্ষ গলায় চেঁচিয়েছিল "লাগেনি তার কি, লাগতে পারতো। মরিনি, মরতে পারতাম। লাগেনি বলে তোমার দোষ কেটে যায়নি। বড়োলোক হলেই যে রাস্তার লোকের ওপর দিয়ে গাড়ী চালাতে হবে তা'র কোন মানে নেই! চলো তুমি আমার সঙ্গে থানায়।"

দেখতে দেখতে রাস্তায় ভীড় জমে ওঠে।

ভীতত্রস্ত কিশোরটি প্রমাদ গণে।

সে বেচারী বাবার অজানিতে গাড়ীটিকে বার করে নিয়ে এসে একটু সখ মিটোচ্ছিলো, এ রকম হবে কে জানে। অবিশ্যি ছেলে সে ভীতু নয়, তবে অবস্থাটা বেকায়দা যে!

সে ভীড়ের কান বাঁচিয়ে কানুকে বলতে থাকে "মাপ করো ভাই, কিছু মনে কোরো না ভাই। থানায় নিয়ে গেলে গাড়ীটা ঠিক কেড়ে নেবে। আমার তো আর লাইসেন্স নেই।"

চালাক কানু কথাটা বুঝে নেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে আরো রোখালো গলায় বলে "কী তোমার লাইসেন্স নেই? তা'হলে তো—"

"আস্তে ভাই আস্তে, দোহাই তোমার। তুমি বরং আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে চলো, তুমি যা চাইবে তাই দেবো।"

অন্য সময় হলে ছেলেটা যে কানুকে 'ভাই' বলার কথা ভাবতে পারতো না, তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু বলেছি তো বেকায়দা! বেকায়দায় পড়লে বাঘও হরিণকে 'ভাই' বলে।

"বেশ"। বলে কান্নু গম্ভীর চালে গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী এসে থামলো বিরাট একটা বাড়ীর গেটের সামনে।

হ্যাঁ, সেই বিরাট বাড়ীটার মধ্যেই আশ্রয় পেয়েছিলো কান্নু। কেমন করে পেয়েছিলো সে এখন মনে করা শক্ত। হয়তো নিরাশ্রয়রা শুধু নিজের দরকারে থেকে যায় ব'লেই আশ্রয় পেয়ে যায়, আর যাদের অনেক জায়গা, তারা চক্ষুলজ্জায় বলতে পারে না 'তুমি যাও।'

কান্নু রয়ে গেলো।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কান্নুর পরিচয় ওরা আদায় করতে পারেনি, তবু ওরা এটুকু বুঝেছিলো, ছেলেটা ভদ্রঘরের ছেলে। স্কুলে প্রথমশ্রেণী অবধি পড়েছিলো, বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে।

এ এক আজব বাড়ী।

কান্নু অবাক্ হয়ে দেখে এ যেন তার এতো দিনের জানা পৃথিবীর উল্টো-পিঠ!

এখানে বড়োরা ছোটদের সমীহ করে কথা বলে পাছে তারা রাগ করে, ছোটরা ইচ্ছে করে বড়দের অগ্রাহ্য করে।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বাড়ীতে ছেলেমেয়েই বা কতোগুলো!

দুই কর্তার মিলিয়ে অন্ততঃ আট দশটা ছেলেমেয়ে। এরা যে কখন বাড়ী থাকে কখন থাকে না, কখন লেখাপড়া করে, কখন খায় দায় কিছুই হিসেব করে উঠতে পারে না কান্নু।

যে ছেলেটা কান্নুকে গাড়ীচাপা দিয়েছিলো এবং সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ওকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলো, তার নাম তপন। বড়োকর্তার ছোটছেলে সে। ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলেজে ঢুকেছে। কান্নুর মতো একটা স্কুলপড়া গাঁইয়া ছেলেকে সে মনিষ্যির মধ্যেই গণ্য করতো না, যদি না সেদিন গাড়ীচাপা'র ব্যাপারটা ঘটতো। দায়ে পড়ে

তাকে সেদিন কানুকে বন্ধুর পর্য্যায়ে তুলতে হয়েছিলো। কিন্তু কেন কে জানে এই তুটি অসম অবস্থার ছেলের মধ্যে সত্যিকার একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। প্রথমটায় একপক্ষের ভয়ে, শেষে বোধ করি উভয়পক্ষের ভক্তিতে।

তপন প্রথমে ওকে বাড়ী এনেই চট্ করে নিজের পড়ার ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে বলেছিলো "তোমাকে যখন বন্ধু বলেছি, তখন নিশ্চয়ই তুমি আমার নামে কারুর কাছে কিছু লাগিয়ে দেবে না, কি বলো ?

কানু একবার ওর মুখের দিকে কেমন রুক্ষ রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকায়, তারপর গম্ভীরভাবে বলে "বন্ধু না বললেও লাগাতাম না। আমি আমার শত্রুর নামেও কখনো লাগাতে যাই না।"

তপন ঠিক এ ধরণের উত্তর আশা করেনি, একটু থতমত খেয়েই ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে "তুমি তো তাহলে খুব মহৎ দেখছি।"

কানু বসেছিলো একটা চেয়ারে, দাঁড়িয়ে উঠে বলে "তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করবার জন্যেই বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এলে ?"

আর একবার থতমত খেলো তপন। দেখলো একে নেহাৎ হেলাফেলা করা চলে না। এর মধ্যে যেন একটা নতুন কিছু আছে। কী সে ? আগুন না কি ?

আগুনের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরকালের। নিজের থেকে যদি কাউকে কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তা'র সঙ্গেই মেশবার ইচ্ছে করে ছেলেদের। ইচ্ছে করে তা'কে সন্তুষ্ট রাখতে। তপনের হঠাৎ মনে হলো এই রাস্তার ছেলেটা কোথায় যেন ওর থেকে শ্রেষ্ঠ। এবারে তাই নরম সুরে একটু হেসে বললো "তুমি আচ্ছা রাগী তো দেখছি। ঠাট্টাতেও রাগ ? শোনো এসো, রাস্তায় পড়ে গিয়ে তোমার গায়ে ধুলো-কাদা লেগে গেছে, একটু গা ধুয়ে নেবে চলো। না হ'লে বাড়ী গিয়ে বকুনি খাবে।"

বাড়ী !

কানুর ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো—বাড়ী! বললো "আমার বাড়ী নেই।"

"বাড়ী নেই?" তপন একটু অবাক্ হয়েই কি ভেবে বলে—"ও! তুমি বোর্ডিংে থাকো বুঝি?"

"না।"

"বোর্ডিংে নয়? তা'হলে—মানে কোনো আত্মীয়ের বাড়ী বুঝি?"

"না। আত্মীয় টাত্মীয় কেউ নেই আমার।"

তপন অবাক হয়ে বলে "তা'হলে? মানে থাকো কোথায় তুমি?"

"রাস্তায়!"

তপন এবার বুঝে নিলো ছেলেটা নিশ্চয় বাজে কথা বলছে। সত্যি তো আর রাস্তায় থাকতে পারে না মানুষ! অবিশ্যি থাকে না কি আর, তাও থাকে, কিন্তু তপনরা তাদের 'মানুষ' ভাবে না। আর কানুকে ঠিক সে দলে ফেলতেও পারছে না।

হয়তো খুব খারাপ বাড়ীতে থাকে। কিম্বা কিম্বা—ওঃ নিশ্চয় তাই।

তপন ব্যগ্রভাবে বলে, "তুমি রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসোনি তো ভাই?

কানু বিরক্তভাবে বলে, "আমি কি করেছি না করেছি—তা' জেনে তোমার কিছু লাভ আছে?"

তপনের যেন উত্তরোত্তর চমক লাগে। এইটাই মজা, যারা শুধু মান্য সম্ভ্রম পেয়ে আসছে, তারা যদি হঠাৎ এরকম অগ্রাহ্য, অবহেলা পায়, তা'হলে নতুন ধরণের একটা চমকের আকর্ষণ অনুভব করে। তাই রাগের বদলে বড়োলোকের আদুরে ছেলে তপন, যে ছেলে মিনতি করা কাকে বলে জন্মে জানে না, সে মিনতির মতো করে বলে, "লাভ-লোকসান আবার কি ভাই, তোমাকে বন্ধু বলে মনে করছি তাই—"

এবারে একটু নরম হলো কানু, গম্ভীরভাবে বললো, "আমাকে বার-বার বন্ধু বলছো কেন? তুমি এতো বড়োলোকের ছেলে, আর আমি একটা রাস্তার লোক।"

তপন ওর হাত ধরে ফেলে বলে, "বাঃ আর তুমি রাস্তার লোক থাকবে কেন ? এখন থেকে এখানেই থাকবে।"

"এখানে থাকবো ?"

হো-হো করে হেসে উঠেছিলো কানু, বলেছিলো "এখানেই থাকবো ? কি সম্পর্কে ? কোন দাবিতে ?

তপন বলেছিলো, "বলেইছি তো, আমার বন্ধু হ'লে তুমি, এই দাবিতে।

সেই দাবিতেই না হোক, তবুও থেকে গেলো কানু। হয়তো বা থেকে যেতে হলো বলেই থেকে গেলো। রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে লেখাপড়া হবার যে কোনো উপায় নেই, এটা বুঝেছিলো কানু, আর এটা স্থির সঙ্কল্প করেছিল লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে, মানুষ হতেই হবে। অতএব তপনের সাহায্য একটু নেওয়াই ভালো। তাছাড়া এখানে কেউ কাউকে তাকিয়ে দেখে না বলেই থাকা সহজ হলো।

তবে কানুর চোখে এ এক মজার বাড়ী !

ছেলেরা বেড়িয়ে ফিরতে রাত করলে কেউ বকে না, লেখাপড়া করছে কিনা কেউ দেখে না। তারা কখন খায়, কখন শোয়, বামুন, চাকর ছাড়া কেউ জানতে পারে না। অথচ তারা যখন যা ইচ্ছে করছে, তখনই পেয়ে যাচ্ছে। শুধু বলতে যা দেরী।

তপনের কাকার ছেলে স্বপন।

তার কথা ভাবলে এখনো আশ্চর্য্য লাগে। ওইটুকু ছেলে ম্যাট্রিক দেবে এবার, কিন্তু মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে। বন্ধুও তার অসংখ্য। পাড়ার ফুটবল ক্লাবের ফুটবল ছিঁড়ে গেছে, স্বপন দেবে ! দলকেদল বন্ধু কুল্‌পী বরফ খেলো, স্বপন দাম দেবে। পাঁচজনাকে জুটিয়ে সার্কাস দেখতে যাবে স্বপন একলা সবাইকার টিকিট কিনে দিয়ে। বোটানিক্‌সে বেড়াতে গেলো সবাই স্বপনের ঘাড় ভেঙে। কোনো ব্যাপারে তপন যেখানে এক টাকা চাঁদা দেয়, স্বপন দেয় চার টাকা।

তা' বলে স্বপন বোকা নয় মোটেই।

আসল কথা সে যে বড়োলোকের ছেলে, সেটা ভালো করে জানিয়ে দিতে চায় বন্ধুবান্ধবকে। কথাবার্ত্তাও তার তেমনি চালিয়াতের মতো।

একদিন কানু বলেছিলো, "তুমি যে এতো টাকা খরচ করো, পাও কোথায় ?"

স্বপন মুচ্ কি হেসে বলে, "পাই কোথায় মানে ? কেন আমার বাবা কি বেকার ?"

"আহা তা' নয়, মানে তোমার বাবা এতো বাজে খরচ করতে টাকা দেন ."

"বাবা ?"

স্বপন আর একটু রহস্যের হাসি হেসে বলে, "বাবা কি আর সেধে সেধে দেয় ? মার ভয়ে দেয়।"

"তার মানে ?" কানু অবাক হয়ে বলে, "তোমার বাবা তোমার মাকে ভয় করেন ?"

"আহা রে! ন্যাকা চৈতন!" পাকাটে হাসি হেসে স্বপন বলে, "বোঝনা কিছু ? বাবা মাকে যমের মতোন ভয় করে বুঝলি ? আর এদিকে মা আমাকে যমের মতোন ভয় করে।"

"ধেৎ, তুই ঠাট্টা করছিস !" কানু অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

"ঠাট্টা মানে ? দেখিস লক্ষ্য করে। আমি যক্ষুনি যা চাইবো, না দেবার সাধ্যি আছে নাকি মার ? বাবা দিতে আপত্তি করলে রাগারাগি করে। নয়তো লুকিয়ে পকেট থেকে সরায়।

কানু গম্ভীরভাবে বলে, "ছিঃ এটা কিন্তু তোর মার খুব অন্যায়।"

"আহা! কি আমার ন্যায়বাগীশ এলেন রে! সরাবে না তো কি ? বাবারই বা কী এমন পুণ্যির টাকা ? সেও তো স্রেফ চুরির ব্যাপার।"

কানুও অবশ্য নিজের বাবাকে কখনও ভক্তি করতো না, কিন্তু স্বপনের কথায় সেও চমকে ওঠে। আরক্তমুখে বলে "তার মানে ?"

"মানে ?" মিটিমিটি হাসে স্বপন, "বাবা একটি পয়লা নম্বরের ঘুষখোর, বুঝেছিস ?"

"ঘুষখোর !"

"তবে আবার কি ! বাবা ঘুষ খায়, কাকা রেস্ খেলে, নইলে আমাদের এতো টাকা কিসের ?"

কানু অবাক হয়ে তাকায়।

ঘুষ খায়, রেস্ খেলে ! কানু তো জানে সে সব খুব খারাপ কাজ। এতো ভালো ভালো দেখতে স্বপনের বাবা, কাকা, তারা এইরকম ! ও অবাক হয়ে গিয়ে একটা বোকার মতো কথা বলে বসে। বলে, "ওঁরা তো শুনেছি খুব বিদ্বান্ ?"

"বিদ্বান্ তা' কি ? বিদ্যে দিয়ে তো ছাই হয়। বিদ্যে থেকে অনেক বেশী টাকা হয়না রে ! বেশী টাকা রোজগার করতে চাস্ তো বাঁকা পথ ধরতে হবে। এই হচ্ছে স্পষ্ট কথা।"

কানুর মনে আগুন আছে, বিদ্রোহের আগুন, কিন্তু তার পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য মনের কাছে এ ধরণের কথা বড়ো ভয়ঙ্কর নতুন ! ও আচ্ছন্নের মতো বলে, "কিন্তু ব্যবসা করলেও তো অনেক টাকা হয়।"

স্বপন হেসে উঠে বলে, "তুই একটা গাঁইয়া ভূত ! ব্যবসা করে অনেক টাকা কি আর যুধিষ্ঠিরমার্কাদের হয় ? যারা জোচ্চুরী করতে পারে, জিনিসে ভেজাল দিতে পারে, লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে, তাদেরই হয়, বুঝলে হে !"

"স্বপন !" কানু ওর হাতটা চেপে ধরে বলে "এ কথা সত্যি ? ওতে পাপ হয় না ?"

"পাপ ! বাবাঃ ! তুই যেন একেবারে ভূত 'দেখার মতো ভয় খেয়ে গেলি। সাধে কি আর বলছি গাঁইয়া ভূত ! পাপ পুণ্যি বলে জগতে কিছু নেই বুঝলি, টাকাই হচ্ছে সব।"

গাঁইয়া ভূত ! গাঁইয়া ভূত !

বড়ো অপমানকর কথাটা !

কথাটা নিয়ে অনবরত তোলাপাড়া করতে থাকে কানু, আর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছয় স্বপনের কথাই ঠিক। টাকাই সব !

কানুকে টাকা রোজগার করতে হবে।

এ বাড়ীতে অনেক ছোট ছেলেমেয়ে।

মাধু, হাসি, বেলা, বাপী, মন্টু, নীলু। কেন কে জানে এরা ভারী ভক্ত হয়ে উঠলো কানুর। অষ্টপ্রহর ওদের মুখে খালি 'কানুদা 'কানুদা'। নিজেদের দাদা দিদিদের কাছে আমল পায়না বলেই ওদের এই আকর্ষণ ! তা'ছাড়া কানুর এমন কতকগুলি গুণ আছে, যা তাদের নিজেদের দাদাদের কাছে পাওয়া অসম্ভব।

কানু রঙিন কাগজ জুড়ে জুড়ে ফানুস তৈরি করতে পারে, কানু রংমশাল আর উড়ন তুবড়ির মসলা বলে দিতে পারে, কানু সামান্য একটু তুলো, পিজবোর্ড আর সুতো দিয়ে অসামান্য রকমের সব মুখোশ তৈরি করতে পারে, কানু 'হরবোলা' ডাকতে পারে, সর্বোপরি কানু 'কবির লড়াইয়ে'র গান গাইতে পারে।

ছোটদের চোখে কানুদা একটি মস্ত লোক। স্বপনের বোন—'না ছোট না বড়ো' সুধা, যেন এসব ব্যাপার নেহাৎ কৃপার চক্ষে দেখে। অথচ আড্ডায় আসাটি চাই তার। মনে হয় যেন কানুকে রাগাবার জন্যেই ওর আসা।

হয়তো বাচ্চাগুলো কানুকে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে গিয়ে হাজির হলো, সুধা সেখানেও হাজির। ছোটরা যখন কানুর গুণপনায় মোহিত, সুধা তখন ঠোঁট উল্টে বলবে "আহা ভারী তো ! কে না পারে ?"

কানুর স্বভাবে এ রকম সহ্য করা শক্ত, সে চটে উঠে বলে "কে না পারে বললেই হলো ? নিজে তো পারার মধ্যে পারো শুধু মাথায় বাহার করে ফিতে বাঁধতে ! কই হরবোলা ডাক্ ডাকো দিকি ?"

সুধা দুষ্ট হাসি হেসে বলে "দায় পড়েছে আমার গাধার ডাক, শেয়াল ডাক ডাকতে। ও যাকে মানায়, সেই ডাকবে।"

কী! কী বললে!" বিচলিত কানু ক্রুদ্ধ স্বরে বলে "তোমার ভারী সাহস দেখছি! জানো ফুলি এ রকম কথা বললে, তাকে—"

হঠাৎ থেমে যায় কানু।

বোধহয় বোঝে এ তুলনা অর্থহীন। কোথায় সুধা আর কোথায় ফুলি! কিন্তু করবেই বা কি, সুধাকে দেখলেই সবসময় যে তার খালি খালি ফুলির কথা মনে পড়ে যায়, দু'জনের যেন কোথায় কোনখানে বিশেষ একটা মিল আছে। কিন্তু কি সেই মিল? কানু জানেনা, বোঝেওনা।

কানু চুপ করতেই কিন্তু সুধা কথা বলে ওঠে "কি হলো? কথা বলতে বলতে থামলে যে? ফুলি কে?"

"কেউ নয়!"

গম্ভীর ভাবে বলে কানু।

"কেউ নয় মানে?" সুধা ব্যগ্রভাবে বলে "তোমার বোন বুঝি?"

"না।"

"তবে কে বলোই না শুনি।"

"বললাম তো কেউ নয়! তোমার ভারী কৌতূহল তো! ফুলি কখনো কোন কথা—"

আবার সেই ফুলির কথাই এসে পড়ে, আবারও চুপ করে যায় কানু। চুপ করা ছাড়া উপায় কি। ফুলির সূত্রে যদি কানুর পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়, যদি এরা খবর দিয়ে বসে কানুর বাপকে! তাই না ফুলি সম্বন্ধে এতো সাবধানতা! অথচ ফুলি ছাড়া আর কারো কথাই যে ছাই মনে আসেনা।

"আবার ফুলি?"

সুধা গম্ভীর ভাবে বলে "ও বুঝেছি, ফুলি তোমার বন্ধু। বলো ঠিক বলেছি কি না!"

কানুও গম্ভীর ভাবে বলে "তা অবশ্য বলেছো। কিন্তু আর কিছু জিগ্যেস করতে পারবে না।"

"কেন? কেন? তোমার হুকুম না কি?" হঠাৎ সুধা এক কাণ্ড করে বসে।

কাগজের শিকলি তৈরী করার জন্যে গোছাভর্তি রঙিন কাগজ কেটে রেখেছিলো কানু, সুধা সেগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে ছড়িয়ে উড়িয়ে হুম্ হুম্ করে চলে যায়।

ছোট ছেলেমেয়েগুলো 'আঁ আঁ' করে ওঠে, সুধার প্রতি দাঁত কিড়মিড় করে ছড়ানো কাগজগুলো কুড়োবার চেষ্টা করে, কিন্তু কানু যেন গুম্ হয়ে যায়। রাগ করতেও ভুলে যায় যেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে "দূর আর খেলবো না। ভালো লাগছে না।"

ছেলেমেয়েগুলো বোধ করি হতাশ হয়ে ছোড়দির মুণ্ডপাত করতে থাকে। তারা লক্ষ্য করেছে ছোড়দিই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া। সবসময়ই ওটা খেলা ভণ্ডুল করার তালে আছে। কী গোলকধাম খেলার সময়, কী ক্যারম খেলার সময়, কী বা হরবোলা আর কবির লড়াই, ভূতের গল্প আর শ্মশানকালী পুজোর গল্পের সময়। জমজমাটি মজলিশের মাঝখানে ছোড়দি ঠিক আসবে, আর আলটু-বালটু কথা বলে কেমন একরকম ঢং করে কানুদাকে রাগিয়ে দিয়ে চলে যাবে, বাস! সেদিনের মতো খতম!

সাধে কি আর ছোড়দিকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা ওরা!

দেখতে অবশ্য কানুও পারেনা, দেখলেই মনে মনে বলে "এই যে জ্বালাতনের অবতার এলেন!" কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেনা।

তপন গিয়ে বাপের কাছে তুলেছিলো কথাটা। শুনে বড়োকর্তা মনে মনে চটলেন। এ আবার কি আবদার! রাস্তা থেকে একটা ঘর-পালানে ছেলেকে এনে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এই তো যথেষ্ট, আবার কিনা তার পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে! এমন কথা কে কবে শুনেছে?

কিন্তু ছেলেকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেন না, জানেন একটু কিছু বললেই ছেলে ফোঁস করে উঠবে। তাই ঠাট্টার মতো হেসে

বললেন "কি বললে ? তোমার ওই বন্ধুর ম্যাট্রিক দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে ? ক্ষ্যাপা না পাগল ! স্কুল সার্টিফিকেট না থাকলে একজামিন দিতে দেয় ?

তপন মুচকে হেসে বলে "চেষ্টা করলে কি না হয় ? আপনি গার্জেন হয়ে দরখাস্ত করতে পারেন—ও কোন স্কুলেই কখনো পড়েনি, এ যাবৎ বাড়ীতেই পড়েছে--"

তপনের বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন "তারপর যখন গাড্ডু খাবে ? ও যে ফার্স্ট ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছে, সে কথা বলছে কে ? ও নিজেই তো ? ছেড়ে দাও ও সব কথা।"

তপন গম্ভীর ভাবে বলে "ছেড়ে দেবো কেন ? ওর যা বিদ্যে, আমাকে পড়াতে পারে।"

"তাই নাকি ? এতো বিদ্যের পরিচযটা দিলো কখন ?"

"এতো কথা আপনাকে বোঝানো আমার সাধ্য নয়। মোটকথা টেষ্টে এ্যালাউ হয় কিনা দেখলেই তো বোঝা যাবে।"

"তা পরিচযটা কি দেবো ? তোমার উনি তো আবার নাম ধাম কিছু বলেন না।"

"সে আপনি বানিয়ে কিছু বলে দেবেন। ভাগ্নেটাগ্নে যা হয় কিছু বলতে পারেন।"

এবারে কথা বলেন তপনের মা। তিনি বিরক্তভাবে বলেন "তা কে না কে, একটা রাস্তার ছোঁড়া, তার জন্যে উনি এতো মিথ্যে কথা বলতে যাবেন কেন রে ? এ যে একেবারে দিনকে রাত করা !"

"দিনকে রাত" !

তপন মৃদু হেসে বলে "সে তো আপনারা হরদমই করছেন ! তবে যদি বলেন অন্যের উপকার করতে কেন করবেন, সে আলাদা কথা ! নিজের দরকারে একটা কেন একশোটা মিথ্যে কথাও বলা যায়, তাই না ?"

গট গট করে চলে যায় তপন, আর স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন তার মা বাপ। বিশেষ করে বাবা। কখন কি অন্যায় আচরণটা করছেন তিনি? কিছু তো মনে পড়ে না। হ্যাঁ, তাঁর মেজোভাই, ছোটভাই একটু নীতি-জ্ঞানহীন বটে, কিন্তু তিনি তো ওকালতি করেই যা কিছু করছেন। কত সুখে রেখেছেন ছেলেমেয়েদের, তবু ছেলেরা তাঁকে অগ্রাহ্য, অপমান করতে পারলেই আহ্লাদ পায়।

কেন? কেন?

'কেন' এ প্রশ্ন আজ মিত্তির সাহেবও মনে মনে করেন। দেখছেন তো চারিদিকে তাকিয়ে। দেখছেন আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো যেন ফণাধরা সাপ! ফোঁস্ করেই আছে। মা বাপের অধিকার নেই একটা ন্যায়অন্যায় কথা বুঝিয়ে বলবার! গুরুজনকে মান্যভক্তি করার কথাটা এ যুগে হাস্যকর, বয়সে বড়োদের মুখের ওপর কথা বলে তাঁদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারলেই যেন এ যুগের ছেলেদের বাহাদুরী!

এরা তর্ক করে না, রাগারাগি করে না, করে অবজ্ঞা আর অগ্রাহ্য!

এই তো সেদিন মিত্তির সাহেবের চোখের সামনেই তাঁর এক বন্ধুর ছেলেকে দেখলেন। কি একটা কথা নিয়ে ছেলেকে বকাবকি করছিলেন বন্ধু, ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দিচ্ছে না দেখে মিত্তির সাহেব ভাবছিলেন ছেলেটা খুব নম্র তো, আধুনিক ছেলেদের মতো উদ্ধত নয়। হায় ভগবান! আর বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না, যেই বাপ থেমেছে, ছেলে একটু মুচকে হেসে বললো কি না "আপনার আর কিছু বলবার আছে? থাকে তো তাড়াতাড়ি বলে নিন, আমার একটু কাজ আছে।"

বাপ আর বাপের বন্ধু দু'জনেই হতবাক্!

আর সেদিনকে পাড়ার শ্যামলবাবুর মেয়েটা কী করলো! পাঁচজনের সামনে বাপ তো লজ্জায় লাল! বাড়ীতে না বলে কয়ে স্কুলের দলের সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেন বেড়াতে যাওয়া হয়েছে মেয়ের, এরা তো

ভেবে অস্থির। এখানে খোঁজ নেয়, ওখানে খোঁজ নেয়. স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে তখন, স্কুলের দারোয়ান ঠিক খবর বলতে পারে না। বাড়ীতে কী অবস্থা ভাবো!

সন্ধ্যার পর যখন মেয়ে নাচতে নাচতে বাড়ী এলেন, কার ইচ্ছে করে মেয়েকে তখন আদর করতে? বাপ কাকা বকবে না যাচ্ছেতাই করে? অবিশ্যি বকেছে তারা খুবই। বাড়ীর দরজাতেই বকেছে, বলেছে "যা ইস্কুলেই থাকগে যা, বাড়ী ঢুকতে পাবি না।" ব্যস্, মেয়ে সঙ্গেসঙ্গে গট্ গট্ করে উল্টোমুখো চলতে স্বরু করলো!

ভয় নেই ডর নেই! শ্যামলবাবুই তখন ছুটলেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসতে।

শেষপরে বলে কি না "খেতে পরতে দিচ্ছো, সে তোমরা দিতে বাধ্য, লেখাপড়া শেখাচ্ছো, সে তোমাদের কর্ত্তব্য, তাই বলে এতো শাসন কিসের? এতো শাসন সহ্য করবো না, এটা ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ, প্রত্যেকটি মানুষই মানুষ। তারা গরু-ঘোড়া বাক্স-বিছানার মতো কারো সম্পত্তি নয়।"

একটা স্কুলেপড়া মেয়ের মুখে এই কথা!

আজকালকার বাপ মা তাই ভয়ে আর কিছু বলে না। ভয় মানে তো আর ছেলেমেয়েকে নয়, ভয় আত্মসম্মানকে। ভয় অপমানিত হ'বার ভয়।

সবাই বলছে এ ঔদ্ধত্য এ যুগের কুশিক্ষার ফল, ভুল শিক্ষাপদ্ধতির ফল।

কিন্তু—

মিত্তির সাহেব ভাবেন, এ ফল কি আজই হঠাৎ ফলতে স্বরু করেছে? অনেক অনেক আগে থেকেই এর সূচনা দেখা গিয়েছিলো।

দেখা গিয়েছিল মফঃস্বলে কানুর মতো ছেলেদের মধ্যে, দেখা গিয়েছিলো সহরে তপন স্বপন সুধাদের মতো ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছে অনেক দিন থেকেই।

হয় তো এও এক রকম প্রতিক্রিয়া !

এক সময় এ দেশের মানুষকে সবকিছুই নির্বিচারে মেনে আসতে হতো—দেবতা থেকে সুরু করে পাথরের নুড়িটাকে পর্য্যন্ত, রাজা থেকে রাজপেয়াদাকে ! মানতে হতো মঘা, অশ্লেষা, হাঁচি; টিকটিকি, মানতে হতো শাপমন্যি, তুকতাক, মাদুলী কবচ, মানতে হতো গুরুজন পরিজন পাড়াপড়শী, গো-ব্রাহ্মণ, গুরু পুরুত সব কিছুই।

মানতে মানতে, আর 'না মানলেই সর্ব্বনাশ হবে' এই ভয়ের বোঝা বইতে বইতে মুখ থুবড়ে যাচ্ছিলো তা'র, হঠাৎ দেশের নাড়িতে জাগলো চাঞ্চল্য, দেশবাসীর রক্তে জাগলো বিদ্রোহ।

বিদ্রোহী মানুষ একদিন ভাবতে সুরু করলো 'কেন এই মানা ? আচ্ছা এইবার না মেনেই দেখি। জয় করবো ভয়কে।'

সেই তা'র অগ্রাহ্যের সুরু ! অবাধ্যতার সুরু !

সেই সংকল্পের ক্ষণে তাদের গুরুর নির্দ্দেশ এলো এক নতুন ভয় ভাঙানো মন্ত্র নিয়ে, সে মন্ত্র 'অহিংসা'। তিনি বললেন "হিংসা করো না, কিন্তু ভয়ও কোরো না। তুমি পরাধীন তোমার ভয়ের কাছে, সেখানে স্বাধীন হতে হবে তোমাকে—"

নতুন কথা, নতুন মন্ত্র !

ভয় জয় করার নেশা ধরলো লোকের, তুচ্ছ করলো রাজভয়, আর শাসনভয়, তুচ্ছ করলো সর্ব্বনাশের ভয়। তুচ্ছ করলো মৃত্যুভয়।

তা'র পর—

তারপর আস্তে আস্তে কোন দিক থেকে কি যে হয়ে গেলো। চাওয়ার রূপ গেলো বদলে, মন্ত্রের মূর্ত্তি গেলো মিথ্যে হয়ে, শুধু নেশাটা রইলো প্রচণ্ড তাড়নায়।

তুচ্ছ করবার নেশা !

সেই নেশায় দেশ প্রথমেই তুচ্ছ করে বসলো তার 'অহিংস' মন্ত্রকে, তুচ্ছ করে বসলো তার গুরুকে। তুচ্ছ করতে শিখলো তার সভ্যতার ঐতিহ্যকে। দু'যুগ ব্যাপী অহিংসার শিক্ষাকে ধ্বংস করে সুদে

আসলে পুষিয়ে নিলো দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে। এই রক্তের বন্যা আর দুর্নীতির বন্যার মাঝখানে যারা জন্মালো, প্রথম চোখ মেলে দেখলো যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীকে। তা'রা কোথায় পাবে সভ্যতার শিক্ষা, নম্রতার শিক্ষা, বাধ্যতার শিক্ষা?

এরা জানছে অবাধ্যতাই সভ্যতা, অনমনীয়তাই ফ্যাসান। তাই আজকের ছেলেমেয়ে শুধু ওপরওয়ালাদেরই অপমান করছে না, অপমান করছে নিজেদের আত্মাকেও।

নীতিহীন, লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন অদ্ভুত একটা জাত সৃষ্টি হয়েছে আজকে!

যোগসাধনার 'অষ্টসিদ্ধি' তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে একটিমাত্র সিদ্ধির সাধনায় উন্মাদ হয়ে বেড়াচ্ছে সে জাত, তার নাম স্বার্থসিদ্ধি!

না, আজকের যুগ শুধু আজকেই সৃষ্টি হয়নি, যুগান্তর আগে এর সূচনা। আগে ওপরওলা থেকে অবিচারের চাপ নিচেরতলাকে পিষ্ট করতো, এখন নিচেরতলা থেকে অসহিষ্ণুতার ঠেলা ওপরতলাকে ক্লিষ্ট করছে।

অনন্তকালের বহমান সমুদ্রে অসংখ্য ঢেউ, উঠছে পড়ছে মিলিয়ে যাচ্ছে, কে তার হিসেব রাখে? হিসেব রাখে শুধু সেই ঢেউটার, যে ঢেউ জাহাজ ডোবায়, তীর ভাসায়।

অনেক দিনরাত্রির সমষ্টি নিয়ে একটা জীবন। অসংখ্য ঘটনা দিয়ে সে জীবন ভরাট। সব ঘটনা কার মনে থাকে? মনে থাকে সব কথা? শুধু ঝাপসা ঝাপসা স্মৃতির নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে ভেসে ওঠে এক একটা বিশেষ দিনের স্মৃতি, এক একটা বিশেষ ঘটনার ঢেউ।

হয় তো সে বিশেষটা অন্যের চোখে তুচ্ছ, কিন্তু বিশেষ একজনের কাছে বিশেষ কোনো একটি মুহূর্ত অক্ষয় হয়ে থাকে বৈ কি!

কান্নুর কাছেও অক্ষয় হয়ে আছে ছোট একটা মেয়ের ছোট একটু নির্বোধ ছেলেমানুষী, আর তা'র সঙ্গে নিজের নির্বোধ হৃদয়হীনতা।

খানচারেক দশটাকার নোট।

লুকিয়ে মুঠোয় চেপে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সুধা। কান্নু বুঝি ওর তখনকার ভীত হৃৎপিণ্ডের ধুক্ ধুক্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো।

"এতে চারটে নোট আছে কান্নুদা।"

অবাক হয়ে গিয়েছিলো কান্নু। বলেছিলো "আছে তা'র কি?"

"এতে তোমার একজামিনের ফী দেওয়া হবে না?"

হয়তো হতো।

টাকার দাম সিকি হয়ে যায়নি তখনো। কিন্তু হ'তো তা'তে কি। কান্নু চোখ গোল করে বলে উঠেছিলো "ওতে আমি একজামিনের ফী দেবো?"

"দেবে না কেন? নাও না।"

"নেবো মানে?" কান্নুর বিস্ময় এবার বিরক্তিতে পরিণত হচ্ছে। "তোমার টাকা আমি নেবো কেন?"

"নিলেই বা! নিলে তুমি ক্ষয়ে যাবে না কি? নাও না। তোমার তো দরকার।"

হৃদয়হীন কান্নু তখন অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলো "ওঃ! ভিক্ষে দিতে চাইছো? বাঃ বেশ!"

সুধা আহত ভাবে বলেছিলো "ভিক্ষে আবার কি! এমনি বুঝি কেউ কাউকে দেয় না?"

"আপনার লোককে দিতে পারে, রাস্তার ছেলেকে দিতে যাবে কেন?"

সুধার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিলো, যেমন লাল হয়ে উঠতো ফুলির মুখটা কান্নুর হাতের বেদম চড় খেয়ে। তবু সে বলেছিলো "বেশ, এমনি না নাও, ধারই নাও। বড়ো হয়ে রোজগার করে শোধ দিয়ো।"

"কান্নু আরো তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলেছিলো "আহা মরে যাই!

পরে বড়ো হয়ে রোজ যেন ওঁর সঙ্গে দেখা হবে আমার ! চিরকাল তোমাদের বাড়ী পড়ে থাকবো আমি ?"

সুধা ফুলি নয়, ফুলির মতন ভালোমানুষ নয়। তা'র রাগ আছে, অভিমান আছে, মুখে প্রখর ভাষা আছে। তবু সে কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলেছিলো "চিরকাল তুমি পরের বাড়ীতে পড়ে থাকবে, সেই কথাই কি বলছি আমি ? তা' বলে কখনো কখনো দেখা হবে না ?"

"মোটেই না।" নিষ্ঠুরতাতেই আনন্দ কানুর, তাই সগর্ব্বে বলেছিলো "চলে যখন যাবো জন্মের শোধ যাবো।"

সুধা এরপরও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছে, বলেছে "বেশ, তাই—তাই। কিন্তু কানুদা, উন্নতি করতে না পারলে তো কিছুই হবে না। উন্নতি করতে হলেই লেখাপড়া শেখা দরকার। আর শিখতে হ'লে টাকা চাই। রাস্তায় কেউ তোমার জন্যে টাকা নিয়ে বসে নেই !"

বসে যে নেই, সে কথা কি আর কানুই জানে না ? রাস্তার অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট হয়ে গেছে। তবু অহঙ্কারী কানু কখনো ভবিষ্যৎ ভাবতে শেখেনি। তাই কড়া সুরে বলেছিলো "বসে আছে কি নেই সে আমি বুঝবো।"

আশ্চর্য্য ! সুধা এরপরও রেগে ঠিক্‌রে না উঠে সহসা ভারী নরম হয়ে গিয়েছিলো। নরম হয়ে ব্যগ্রভাবে বলেছিলো "মিথ্যে অহঙ্কারে সব নষ্ট কোরো না কানুদা, তোমার পায়ে পড়ি। ভালো করে পাশ করে এদের একবার দেখিয়ে দাও, যে-সে ছেলে নও তুমি। তারপর তো টিউশনি করেও কলেজে পড়তে পারবে।"

পাশ !

কলেজ !

লোভে সমস্ত মনটা দুলে উঠেছিলো কানুর। 'ভগবান বলে কিছু নেই' জেনেও ভুল ভুলে সে কাল সারারাত ধরে ভেবেছে—ভগবান যদি কিছু টাকা তাকে হঠাৎ পাইয়ে দেন। সেই টাকাই আজ এসে গেছে হাতের মুঠোয়। কিন্তু সে টাকা নিতে পারবে না। অহঙ্কার

আর উচিত অনুচিত বোধ নিতে দেবেনা তাকে। তাই রূঢ়স্বরে বলে উঠেছিলো "আমার জন্যে তোমার এতো মাথা-ব্যথা কেন? নিজের চরকায় তেল দাওগে না।"

এ অপমানে সুধার চোখে হঠাৎ জল এসে গিয়েছিল, সেই জলভরা চোখে ছুটে পালিয়েছিলো সে এই কথা বলতে বলতে "ঠিক আছে। আর বলবো না। এই জন্যেই বলে কলিকালে কারুর ভালো করতে নেই—"

কান্নাকান্না মোটে সহ্য করতে পারে না কানু। তাই তখন কেমন হ্যাবাচ্যাকার মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। আর বার বার ভেবেছিলো 'টাকাটা না হয় না নিতাম, এতো কড়া কথা না বললেই হতো।'

সেদিনের কথা ভাবতে গেলে এখনো যেন মনটা কেমন করে ওঠে।

সুধার টাকা কানু নেয়নি, কিন্তু সুধাদের বাড়ী থেকেই টাকাটা জোগাড় করেছিলো। ছি ছি! সে কথা মনে পড়ে গেলে এখনো যেন লজ্জায় মাথাকাটা যায় কানুর। তবু এও ঠিক, সঙ্গদোষই কানুকে সেই ছোট কাজে প্রবৃত্ত করেছিলো। অথচ সে সঙ্গ ছোটলোকের নয়, বড় লোকের ছেলেদেরই। এদেরই। স্বপন আর তা'দের ভাইদের এবং বন্ধুদের। মনে আছে একদিন বাড়ী থেকে খানিক দূরে একটা গলির মোড়ে স্বপন আর তার দুটো বন্ধুর কাণ্ড দেখে যেন নিশ্বাস আটকে গিয়েছিলো কানুর। চোখের তারা শক্ত করে কাঠ হয়ে গিয়ে বলে উঠেছিলো সে "স্বপন, তোমরা সিগারেট খাও?" আর কানুর সেই চমকানি দেখে অন্য ছেলে দুটো একেবারে হি হি করে হেসে উঠে ওর গায়ের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বলেছিলো—"বটে নাকি! অ্যাঁ তাইতো! স্বর্গের দেবদূতটি কোথা থেকে এলো হে! ও স্বপন, এই চীজ্‌টিই বুঝি তোর দাদার আমদানী সেইটি?"

বোঝা গেলো স্বপন কানুর নামে বেশ কিছু গল্প করেছে বন্ধুদের কাছে। বিস্ময়ে দুঃখে ধিক্কারে আর এই ঠাট্টায় কানু হঠাৎ এক মিনিট কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিলো, সেই অবসরে স্বপন ওর মুখে একটা

সিগারেট গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলেছিলো "আহা রে! চাষা কি জানে মদের স্বাদ! খেয়ে দেখ্ না একবার, বুঝবি কি মজা!"

কানু ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এসে একেবারে সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বসে বসে বেশ কিছুক্ষণ হাঁপিয়েছিলো।

তারপর?

হ্যাঁ, তারপরের কথাও মনে আছে বৈকি। একটু পরেই কি কাজে যেন স্বপনের মা এসেছিলেন সে ঘরে। এসেই থমকে গেলেন কানুকে চৌকীর ওপর বসে হাঁপাতে দেখে। বললেন "কি হলো কানু? অমন করে হাঁপাচ্ছো যে?"

ঠিক সেই মুহূর্তে না হ'লে হয়তো কানু নিজেকে সামলে নিতো, হয়তো বলতো না, কিন্তু তখন কানুর নিজের ওপর কন্ট্রোল ছিলোনা। তাই তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতেই চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, "জানেন মেজ কাকীমা, স্বপন সিগারেট খায়।"

শুনে স্বপনের মা—হ্যাঁ, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে সেও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—শুনে স্বপনের মা চমকে ওঠেননি, শিউরে ওঠেননি, উল্টে রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন কানুরই ওপর। জ্বলন্ত চোখে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, "এসব আজগুবি খবর কে আমদানি করছে তোমার কাছে?"

তবু তখনো ঠিক অবস্থাটা বুঝতে পারেনি কানু, তাই তেমনি উত্তেজিত হয়ে বলেছে, "আমি নিজের চোখে দেখলাম।"

"তোমার নিজেরই বোধহয় গাঁজার মাত্রাটা আজ বেশী হয়ে গেছে—" বলে মেজকাকী আঁচল দিয়ে সামনের টেবিলটা অকারণ জোরে জোরে ঝাড়তে থাকেন।

কানুর আর জ্ঞান থাকে না, সে তীব্রস্বরে বলে ওঠে "ওঃ নিজের ছেলের দোষ বিশ্বাস হচ্ছে না! আমি জ্যাঠামশাইকে বলে দেবো!"

এবার মেজকাকী নিজমূর্তি ধরেন। তীক্ষ্ণ কটুকণ্ঠে বলেন, "তুমি বলে দেবার কে শুনি? তুমি বলে দেবার কে? আমার ছেলে যদি

উচ্ছন্নে যায়, তোমার কি রাইট্ আছে কথা বলবার? ও যদি সিগারেট খেয়ে থাকে, ওর বাপের পয়সায় খেয়েছে, তোমার তো খেতে যায়নি। ওর ইচ্ছে হ'লে ও মদ খাবে বুঝলে?"

গট্ গট্ করে চলে গিয়েছিলেন মেজকাকী।

আর কানু আরো বেশী হাঁপাতে সুরু করেছিলো।

ওর কিশোর মনের ওপর কে যেন একটা বিশ মণ পাথর চাপিয়ে দিয়ে গেছে, তার ভার বইতে পারছে না সে।

একটু পরেই তপন এলো শীস্ দিতে দিতে। একটা চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে উঠলো "সবাই নাচে ফুর্ত্তি করে সবাই গাহে গান, একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান?"

কানু আড়ষ্ট কঠিন।

তপন কিন্তু ওকে সত্যিই ভারী ভালো বেসে ফেলেছে। তাই বুঝতে পারে এটা কানুর স্বাভাবিক মন খারাপ নয়। চেয়ারটা শুদ্ধ ঘড়ঘড় করে টানতে টানতে সরে এসে বলে "কি হয়েছে রে? কেউ কিছু বলেছে?"

কানু নীরব।

তপন উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে "কনে-বৌ বনে গেলি যে? হলো কি?

কানু এবার দাঁড়িয়ে উঠে বলে "আমি আর এখানে থাকবো না, একখুনি চলে যাবো।"

তপন একটু থতমত খেয়ে বলে "কেন কেন, কি হলো তাই বল্না।"

কানু এবার গড়গড় করে বলে যায় ওর আজকের সমস্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী। ধিক্কারে আর রাগে ওর কান লাল হয়ে ওঠে, বার বার গলা বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু—কিন্তু আশ্চর্য্য, তপন নির্ব্বিকার। কানুর কথা শেষ হলে ও একটুখানি হেসে বলে, "আচ্ছা কানু, তুই অন্যদিকে তো বেশ বুদ্ধিমান, তবে এদিকে এতো বোকা কেন বলতো?"

"বোকা!"

"তা' ছাড়া আর কি ! অন্য লোক খারাপ হলে তোর অতো রাগ চড়ে ওঠে কেন ? তোর কি ক্ষতি তাতে ?"

"আমার কি ক্ষতি ?" কানু মূঢ়ের মতো বলে "ও ওইটুকু ছেলে সিগারেট খাবে, ওর মা তাতে প্রশ্রয় দেবেন, এই সব সহ্য করবো ?"

"কেন করবি না ? পৃথিবীতে কতো বদমাইস লোক আছে, রাত-দিন কতো খারাপ খারাপ কাজ হচ্ছে, তুই সব সামলাতে পারবি ?"

"তা কে বলছে ? তা'বলে চোখের ওপর —"

তপন মুচ্‌কি হেসে বলে "তোর চোখটা এখনও সম্পূর্ণ খোলেনি কিনা তাইতেই যা দেখিস তাতেই এতো চম্‌কে চম্‌কে উঠিস ! সম্পূর্ণ খুলে গেলে দেখবি চোখের ওপর আরো কতো খেলা চলছে। দুনিয়া-খানাই এই রে ব্রাদার ! স্বপন সিগারেট খেয়েছে দেখে তুই একেবারে কাঁটা হয়ে গেছিস দেখে আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না। আমিও তো কতো খেয়েছি—"

"তুমিও—"

"হ্যাঁ ! অনেকবার ! খেতে ভালো লাগে না, কাসি আসে বলে খাইনা আর। সিগারেট ! হুঁঃ।"

তপন মুচকে মুচকে হাসতে থাকে, তারপর বলে, "একদিন তো মদও খেয়েছিলাম !"

"মদ !" এইটুকুই শুধু উচ্চারণ করতে পারে কানু।

"হ্যাঁ। হয়েছে কি ? খাবার জিনিষই তো ? খেয়ে দেখলাম একদিন। বিচ্ছিরি খেতে, তেতো !"

কানু রুদ্ধস্বরে বলে "কোথায় পেলে ?"

"পেলাম ? পেলাম—ছোট্‌কার ঘর থেকে চুপি চুপি চুরি করে—"

"তোমার ছোটকাকা মদ খান ?"

তপন এবার হো-হো করে হেসে ওঠে। হেসে কানুর মুখের কাছে হাত দুটো দুলিয়ে সুর করে বলে—

"আমি কোনরূপে স্বর্গ হতে টস্‌কে,
পড়েছি এ মর্ত্যভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে—"

ওহে ব্রাদার, এ মাটির পৃথিবী তোমার জন্যে নয়। হোট্কা মদ খায় জানিস না তুই?"

কানু ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

তপন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে "ছোট্কা তো তবু ফ্যাসান করে একটু আধটু খায় রে, মেজকা তো পাঁড়মাতাল। দেখিস না সন্ধ্যের পর আর ঘর থেকে বেরোয় না। মেজকাকী বেরোতে দেয় না; লোক জানাজানির ভয়ে! হুঁঃ! লোকে যেন আর জানেনা!"

কানু এবার গম্ভীরভাবে বলে, "বুঝেছি। বুঝেছি কেন মেজকাকী ছেলের দোষ চাপা দিলেন।"

"বুঝেছিস তো? বাঁচলাম। রোস্ তোকে আমি ক্রমশঃ বখিয়ে তুলবো। একটু বখা না হলে বুদ্ধি পাকা হয় না বুঝলি? মদ খাওয়ার জন্যে কিছুনা, ওতে আমি ততো দোষ ধরিনা, খাবার জিনিষ খাক্‌গে। ওর চেয়ে আরো কতো নিচু কাজ করছে ওরা। জাল জোচ্চুরী ঘুষ খাওয়া, সে অনেক ব্যাপার! ছেলেরা সিগারেট খেলে বকবে আর কোন মুখে?

কানুও চিরদিন উদ্ধত, চিরদিনই বাপ কাকাকে অশ্রদ্ধা আর ঘৃণা করে এসেছে, তবু বুঝি এদের মতো এমন নয়। তাই চুপ করে চেয়ে থাকে। তপন এবার আবার বসে পড়ে পা দোলাতে দোলাতে বলে "আমি সব বুঝতে পারি জানে বলেই তো আমাকে সবাই ভয় করে, কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না, বুঝলি?"

কানু ধীরে ধীরে বলে "জ্যেঠামশাইও ওই রকম?"

"বাবা? নাঃ বাবা অবিশ্যি ওদের মতো নয়। কিন্তু তাতে কি? আমি ইচ্ছে করেই কাউকেই কেয়ার করি না। জানিস না তুই, বড়োদের স্বভাবই হচ্ছে একটু মান্য করলেই একেবারে পেয়ে বসা! ওরা চায় সন্তান হবে একেবারে ভক্ত হনুমান! কেনরে বাপু? নিজেরা তা'হলে রামচন্দ্রের মতো ভালো হও? তা নয়—নিজেরা যা তা হবো, ছেলেরা অবতার হবে! মাষ্টারগুলোও তাই! নিজেরা একের নম্বর—"

কানু হঠাৎ তীব্রস্বরে বলে ওঠে "সব মাষ্টার কক্‌খনো সে রকম নয়।"

তপন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে "ও; তোর কপালে বুঝি একটা ভালো মাষ্টার জুটেছিলো? তা কি জানি! তুই তো কখনো নিজের কথা বলিস না।"

কানু সহসা বিচলিত হয়ে ওঠা মনকে ঝেড়ে ফেলে গম্ভীরভাবে বলে "আমার কোনো কথা নেই। কিন্তু একটা কথা ভাবছি—"

"কি কথা?"

"তোমরা যে এইসব করো—মানে বায়োস্কোপ দেখা, ফুটবল ম্যাচ দেখা, ইয়ে—সিগারেট ফিগারেট খাওয়া, এ সব পয়সা কোথায় পাও? তোমরা তো আর রোজগার করো না।"

তপন হেসে উঠে বলে "নাঃ তোকে আর মানুষ করা যাবে না। কোথায় আবার পাবো? বাবার পকেট থেকে না বলে চেয়ে নিই। অবিশ্যি 'হাত খরচ' বলে মার কাছ থেকে মাসে দশটা করে টাকা পাই, কিন্তু তাতে আর ক'দিন চলে? মেজোকাকীর ছেলেটার তো দু'দিনও হয় না। বন্ধুবান্ধবদের জন্যেই কতো খরচা ওর!"

কানুর চোখ জ্বালা করতে থাকে, ও ধীরে ধীরে বলে "টের পায় না তোমাদের বাবা কাকা?"

"টের! আমার বাবা পায় না। সত্যিই পায় না। পকেটেই সব সময় গাদা গাদা টাকা! উকিলের কাঁচা পয়সা তো? তবে স্বপনের ব্যাপার আলাদা। ওদিকে মেজোকাকী আর মেজকা দুজনেই সজাগ আছে। কাজেই স্বপন ওদের আলমারীর একটা ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে রেখেছে। সুবিধে পেলেই আলমারী খুলে সরায়।"

হ্যাঁ জ্ঞানদৃষ্টি খুলছে বৈ কি, এখুনি খুলতে সুরু করেছে কানুর। বুঝতে পারছে, সুধা ছেলেমানুষ কোথায় পেলো চার চারখানা দশটাকার নোট। নিশ্চয়ই সেই ডুপ্লিকেট্ চাবিটা হস্তগত করেছিলো। এটা ঠিক, সমবয়সী ভাইবোনদের মধ্যে কখনোই কেউ কাউকে লুকিয়ে কিছু

করতে পারে না। সুধাকেও লুকোতে পারেনি স্বপন। ...বুঝতে পেরেও কিন্তু কেন কে জানে সুধাকে ঘৃণা করতে পারে না কানু, চেষ্টা ক'রেও না।

না, সে বাড়ী থেকে সেদিন যাওয়া হয়নি কানুর। তপনের তত্ত্বজ্ঞানের স্পর্শে ক্রমশঃ সামলে উঠেছিলো সে। তারপর স্বপনের সঙ্গেও ফের মিটমাট হয়ে গিয়েছিলো। স্বপন ওকে পিঠ চাপড়ে বলেছিলো, "তুই যদি এতো ইনোসেন্ট না হতিস তো কত চালাকি শিখিয়ে দিতে পারতাম। আসল কথা কি জানিস, ভালো হওয়ার কোনো মানেই হয় না। কি হবে ভালো হয়ে, পৃথিবীর কেউই যখন ভালো নয়?"

কানু কাঁপা কাঁপা বুকে শোনে। হ্যাঁ, এ অভিমত তো কানুর নিজেরই ছিলো। সেও তো বলেছে ফুলিকে 'ভালো হয়ে কি হবে?' কিন্তু কানুর মনোজগতে 'খারাপ হওয়া' মানে ছিলো শুধু বড়োদের অবাধ্য হওয়া, এদের মতো এমন ভয়ঙ্কর ঘটনাবহুল নয়।

তবু আশ্চর্য্য, এরা এতোর মধ্যেও লেখাপড়াটা দিব্যি চালিয়ে যায়। সে কথাও বলে এরা "যাই করি আর তাই করি, যতোক্ষণ ঠিকমতো পাশ করে যাবো, কেউ কিছুই বলতে পারবে না বুঝলি? মা বাবাও চায় বাইরের লোকের চোখে ছেলের 'গুণ' ধরা না পড়লেই হলো। ভেতরে যতো পাজীই হই না, পড়া লেখায় ভালো হলেই সব্বাই বলবে "আহা হীরের টুকরো ছেলে!"

আর একবার লেখাপড়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে কানু। যে জিনিষটা ছিলো তার স্বর্গীয় স্বপ্ন, সেটা ক্রমশঃ নতুন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। ডিগ্রী চাই। গোটা তিন চার ডিগ্রী নিয়ে নিতে পারলে সমস্ত পৃথিবীকে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে যা-খুশী করা যায়। কারণ লোকের চোখে সে যে তখন 'হীরের টুকরো।'

তপনের অনুরোধে তার এক মাষ্টারমশাইয়ের চেষ্টায় পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়ে যায় কানুর। নন্ কলেজিয়েট্ বলে চালিয়ে দেবেন তিনি। এখন দরকার ফী জমা দেবার টাকার।

ভারী আপশোস্ হতে থাকে এখন কানুর, সেদিন সুধার টাকাটা ফেরৎ দিয়েছে বলে। স্বপন আর স্বপনের বন্ধুদের হাসি তামাসা, দুঃসাহসিক পরামর্শ আর প্রত্যেক বিষয়ে ওকে 'ইনোসেন্ট' বলে ব্যঙ্গ, সবকিছু ক্রমই কিশোর একটি মনকে ঠেলে নিয়ে যায় পাকামী আর ঠকামীর দিকে। আজকাল এদের সঙ্গেই তার ভাব বেশী। সঙ্গদোষে আসে লোভ, আসে অসততা।

'টাকা চাই' 'টাকা চাই' সমস্ত দিন মনের মধ্যে এই বাজনার ঝন্‌ঝনা। তারই ওপর এক একটা কথার তরঙ্গ এসে আছড়ায়।

স্বপনের বন্ধু দিবাকর।

সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে যখন তখন বলে "পাপ পুণ্যি' 'ধর্ম্ম অধর্ম্ম' ওসব হচ্ছে পুরুত বা টাদের তৈরী করা বাক্যি। আসলে সব বুজরুকি! আমি বাবা সাব বুঝি নিজের সুখ সুবিধে। 'দরকার' ইজ্ দরকার। যে করে হোক সেটা যোগাড় করতে হবে ব্যস্। পাঁজী-পুঁথি, শাস্তর, আইন, ওসব ভীতুদের জন্যে।"

দিবাকর কম করে পোনহয় পাঁচ বছরের বড়ো স্বপনের চাইতে, তবু গলায় গলায় বন্ধুত্ব দু'জনের। তপন ঠিক এদের মতো নয়, এদের তপন ঘৃণা করে। কানু যতোদিন থেকে এদের দলে ভিড়েছে ততোদিন থেকে কানুকে অবজ্ঞা আর ঘৃণা করতে সুরু করেছে তপন। আর তাতেই বুঝি একদিন মরীয়া হয়ে ওঠে কানু।

হ্যাঁ, সেদিনটা যেন ছবির মতো চোখে ভাসে। কানুর অদৃষ্টে মেজকাকার বাপের বাড়ীতে কার যেন বিয়ে লেগেছে সেদিন, ওরা সপরিবারে নেমন্তন্ন গেলো সেজেগুজে। টাকার ব্যাপার থেকে সুধা আর সামনে আসে না কানুর। কানু দূর থেকে দেখলো চলে গেলো

সবাই। খালি পড়ে রইলো ওদের ঘরের দিকটা। মেজবাবুর ছোকরা চাকরটা সুদ্ধ্ গেছে নেমন্তন্নে, কাজেই এর চাইতে সুবর্ণ সুযোগ আর কি মিলবে?

স্বপনের ড্রয়ারের চাবিটা হস্তগত করেছে কানু, আর ড্রয়ার হাতড়ে আবিষ্কার করেছে সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটা। সেই মেজকাকীর আলমারির ডুপ্লিকেট চাবি! স্বপনের তৈরি করানো!

সন্ধ্যাবেলা সবাই আপন আপন ব্যাপারে ব্যস্ত, কে দেখতে যাচ্ছে তিন [illegible] মেজকাকা [illegible] ঘরটায় কে ঢুকলো আর কে বেরিয়ে এলো!

[illegible] দিন মনে [illegible] বৈ কি, পৃথিবীর সমস্ত চোখ শুধু কানুর দিকে [illegible] আর কানুর বুকের মধ্যে যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে, তার দুপ দুপ আওয়াজ সেই বাড়ীর সর্ব্বত্র, বাড়ী ছাড়িয়ে রাস্তায়, রাস্তা ছাড়িয়ে আরো অনেক—অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে।

না, কানু সে রাতে খায়নি।

খেতে বসলে বামুনঠাকুর যদি শুনতে পায় সে শব্দ! যদি খপ্ করে ওর জামার কলারটা চেপে ধরে বলে ওঠে "কী কানুদা'বাবু, তোমার বুকের মধ্যে ও কীসের শব্দ?"

রাত্রে অন্ধকারে নিজের সরু ছোট্ট বিছানাটায় জেগে পড়ে থেকে থেকে মনগড়া অনেক যুক্তি দিয়ে দিয়ে মনকে শক্ত করে তুললো কানু।

কী এমন অপরাধ করেছে সে?

সামান্য খান ছয়েক দশটাকার নোট মেজকাকাদের কাছে কী বা মূল্যবান? কতো সময় পকেটেই যাঁর গোছা করে একশো টাকার নোট থাকে! তা'ছাড়া কতোগুলো টাকা তো সুধা তাকে দিতেই এসেছিলো। ধরো যদি তখনই নিতো কানু? তা'হলেই তো আর কানুর দোষ হ'তো না? বেশ না হয় তাই নিয়েছে, ধরো তখন যেন বলেছিলো সুধাকে

'এখন রাখো পরে নেবো।' এমন তো হয়ও। সেই হিসেবে পরেই নিয়েছে, সুধা বাড়ী ছিলো না বলে না হয় নিজে বার করে নিয়েছে। আর—আর অন্ধকারে বুঝতে না পেরে চারখানার জায়গায় ছ'খানা নিয়ে ফেলেছে। শুধু তো এইটুকু! মনকে প্রবোধ দিতে দিতে হাতুড়ীর আওয়াজটা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে গেলো, কিন্তু সারা রাতের মধ্যে ঘুম হলো না এক ফোঁটাও। আর বিছানার তলায় যেখানে সেই জিনিসটা গুঁজে রেখে তা'র ওপর চেপে শুয়ে থেকেছিলো সেখানটায়, পিঠের সেই মাঝখানটায়, অনবরত পোড়ার জ্বালার মতো জ্বলতে থাকলো হু হু করে।

কিন্তু তবু—

তবু অপরাধ স্বীকার করে ফেরৎ দেবার কথা ভাবা যায় না। কানুকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। মানুষ হ'বার জন্যে নয়, ডিগ্রী নেবার জন্যে।

দিবাকর বলেছে 'দু'চারটে ডিগ্রী নিয়ে নিতে পারলে পৃথিবীতে বুক ফুলিয়ে যা খুসি করা যায়।'

সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ফীয়ের টাকাটা জমা দিয়ে এলো কানু। আর জমার পঁয়ত্রিশ টাকা বাদে বাকী পঁচিশটা টাকা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটা পুরোনো ধূলোপড়া অয়েল-পেন্টিঙের ফ্রেমের পিছনের খাঁজে লুকিয়ে রেখে সবে যখন ধূলো হাতটা মুছ্ছে, তখন তপন হঠাৎ তাকে ডাকলো "এই কানু শোন্।"

অনেক দিন তপন এভাবে ডাকেনি তাকে।

স্বপনের দলে ভিড়ে যাওয়া অবধি ব্যঙ্গহাসি হেসে 'এই যে কানুবাবু' বলে সম্বোধন করতো।

কানুর বুকটা হিম হয়ে গেলো।

নিশ্চয়।

নিশ্চয় তার কীর্ত্তি ধরা পড়ে গেছে ! তাই তপন···কিন্তু তপনের মুখে তো ব্যঙ্গ নেই ধিক্কারও নেই, বরং কিছু খুসি খুসি ভাব।

হ্যাঁ, সেদিনকে বুকটা আরো হিম হয়ে গিয়েছিলো কানুর, তপনের কথা শুনে। বরফ পাহাড়ের মতো হিম !

তপন ওকে একান্তে ডেকে বলেছিলো "এই শোন্, বাবাকে বলেটলে তোর একজামিনের টাকাটা আদায় করেছি, এই দেখ্।"

হাতের মুঠো খুলে দেখিয়েছিলো তপন ছ'খানা নোট। কানুর চোখের সামনে থেকে চারিদিক ঝাপ্সা হয়ে সরে গিয়েছিলো। আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! পৃথিবীর সমস্ত টাকাগুলোর কি একই চেহারা ! না কি কোনো মন্ত্রবলে কিছুক্ষণ আগে যে নোটগুলো থেকে কানু কিছুটা বিশ্ববিত্তালয়ের একজন কেরাণীর কাছে জমা দিয়ে এলো, আর কিছুটা অনেক কৌশলে লুকিয়ে রাখলো, সেইগুলোই উড়ে তপনের হাতে এসে পড়েছে ?

এ কী ভোজবাজী ?

তাদের সেই ছোট্ট সহরে মাঝে মাঝে মেলার বাজারে যে বাজীকরটা আসতো, সে তো করতো ঠিক এমনি কৌশল ! নিজের হাতের থেকে উড়িয়ে দিয়ে অন্যের পকেট থেকে বার করতো সেই জিনিসটা ! লোকের ঘড়ি, আংটি, টাকা, রুমাল ! তপন কি বাজী শিখে এসে খেলা দেখাচ্ছে কানুকে ?

তপন বলে চলেছে "যাই হোক তাই হোক, বাবাব শরীরে বিবেচনা যে একেবারে নেই তা নয় বুঝলি ? তবে বিবেচনাটা বড্ডো ভেতরের দিকে থাকে। চোখ রাঙিয়ে সে বিবেচনা টেনে বার করতে হয়। আমার মা'টির কুমন্ত্রণাতেই এই রকম হয়েছে আর কি ! সব সময় খালি ক্যাচ্ ক্যাচ্ করবে 'একে টাকা দেবে কেন, ওকে টাকা দেবে কেন, অতো দেবে কেন, ততো দেবে কেন ?' শুনতে শুনতে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা ঘোলা হয়ে যায়ই। আমিও তাই তাক্ বুঝে মার আড়ালে বললাম। বললাম 'আমার চাইতে কানুর পড়ার দরকার অনেক বেশী। আমি

পাশ না করলেও খেতে পাবো, ও পাবে না। ক'দিন পরেই তো আমার ইণ্টারমিডিয়েটের 'ফী'টা দিতে হতো আপনাকে, সেটাই না হয় দিয়ে দিন। আমি না হয়—আপনার আবার টাকা যোগাড় হ'লে পরের বছর পরীক্ষা দেবো।' শুনে"—মুচকে হাসে তপন, "বাবা বিনা বাক্যব্যয়ে টাকাটা এনে আমার হাতে দিয়ে বেচারী বেচারী মুখে বললো 'এতো কথা বলবার কোন দরকার ছিলো না।' যাই বলিস ভাই, পিসিমা যে বলেন 'ভগবান আছেন'—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, ভগবান বলে কেউ একটা আছেই। নইলে—"

কানুর মনশ্চেতনার ওপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছিলো তপনের কথা-গুলো, ও তখনো সেই ওদের দেশের বাজীকরের কৌশলের কথা ভাবছিলো, হঠাৎ তপনের শেষের কথাটা কানে গিয়ে ধাক্কা মারলো। 'ভগবান আছেন'!

'ভগবান বলে কেউ একটা আছেই।'

সহসা চোখ দু'টো ঠিকরে উঠলো কানুর, কানের মধ্যে যেন লক্ষ করতালির শব্দ! সারা শরীর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে।

"না! না! ভগবান নেই! কক্ষনো ভগবান নেই!" চীৎকার করে উঠলো কানু।

তপন অবাক হয়ে বলে "কী বলছিস পাগলের মতো?"

ওঃ কথাটা পাগলের মতো বলা হয়ে গেছে বুঝি! তাইতো!

কিন্তু পাগল না হয়ে আর উপায় কোথা কানুর? ভগবানের দুর্ব্যবহারেই পাগল হয়ে উঠেছে সে। ভগবান, মানে সত্যিকারের দয়ালু কোনো ভগবান যদি থাকতো, তা'হলে কি সে গতকাল সন্ধ্যাবেলা এই টাকাটা দিতে পারতো না কানুকে? যখনও কানু স্বপনের ড্রয়ারে হাত দেয়নি, সেই তখন? তা'হলে কি কানু চিরকালের মতো ভগবানের ভক্ত হয়ে যেতো না?

ভগবান! ভগবান!

হ্যাঁ আছে ভগবান।

কেবল মাত্র কানুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্যে কোথাও কোনোখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে।

তপন ওর দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে "তোর কি হয়েছে বল দেখি? ওদের সঙ্গে মিশে নেশাফেশা করেছিস না কি?"

রক্তচড়া মাথায় কানু জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রথমে চীৎকার করে বলতে থাকে "হ্যাঁ করেছি নেশা, কি করবি তুই যদি করে থাকি? নিয়ে যা তোর টাকা। ভগবানের দেওয়া টাকায় আমার দরকার নেই, শয়তান আমায় দিয়েছে টাকা। শয়তান ভালো, শয়তানই ভালো—।" তারপরই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তারপর জল, বাতাস, ডাক্তার!

বিপদে পড়ে খরচ করতে বাধ্য হয়েছে ওরা।

তবে বাড়ীর সকলেই সেদিন ধরে নিয়েছিলো কানু কিছু নেশাই করেছে। 'অনভ্যাসের ব্যাপার তো, তাই এমন অবস্থা! নিন্দে আর টিটকারিতে তপনের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিলো। তাই পরদিন সকালেই কানুর ঘুম ভাঙতেই তপন এসে গম্ভীরভাবে তদ্দণ্ডে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলো। তীক্ষ্ণভাবে বলেছিলো "জীবনে কখনও এমনভাবে মাথা হেঁট হয়নি আমার। যাক্ যথেষ্ট শিক্ষা হলো! একটা কথা বলি শোন্, কুকুরের পেটে ঘী সহ্য হয় না বুঝলি? নেশা করা বড়োলোকেরই সাজে। মেজকা ছোটকার মদ খাওয়ার গল্প শুনে ভেবেছিলি তুইও ওদের মতো, তাই না? হুঁঃ! যা, জীবনে আর তোর মুখ দেখতে চাই না।"

স্বপন ওর কাছে হেসে লুটিয়ে পড়লো "কী বাবা ইনোসেণ্ট বয়! শেষরক্ষে করতে পারলে না? যাক্ খুব লীলা-খেলাটা দেখালি বটে কানু!"

জনে জনে সবাই এসে ধিক্কার দিয়ে গিয়েছে, আর বিনা প্রতিবাদে কাঠের মতো বসে থেকেছে কানু। শুধু যখন—

হ্যাঁ, শুধু যখন সুধা এক ফাঁকে এসে চুপি চুপি বললো "সবাই মিলে যে যা বলে বলুক কানুদা, আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যে তুমি—", তখন লাল লাল চোখ তুলে কানু প্রতিবাদ করে উঠলো "কেন, তুমিই বা বিশ্বাস করবে না কেন ?"

"করবো না আমার খুসি। আমি জানি তোমার কোথাও কোনোখানে খুব কষ্ট আছে, তাই তুমি এমন সৃষ্টিছাড়া রাগী। তোমাকে কেউ বুঝতে পারে না তাই—"

কথাটা শুনে কানুর মনটা হঠাৎ অদ্ভুতভাবে তোলপাড় করে উঠলো। ঠিক, ঠিক এই কথাই না ফুলি বলেছিলো একদিন। মেয়েগুলো কি তা'হলে সবাই এক রকম ? বড়োদের থেকে, পুরুষমানুষদের থেকে বেশী বুদ্ধিমান ?

হয় তো কানু নরমভাবে কিছু একটা উত্তর দিতো, কিন্তু ওর কপাল দোষে ঠিক সেই সময় রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে ঘরে ঢুকলেন মেজকাকী।

মেয়ের একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ভিতরের দরজার কাছে ঠেলে দিয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন "তুই এখানে কী করছিস লক্ষ্মীছাড়ি ? যা বাড়ীর ভেতরে যা।" তারপর কানুর কাছে এসে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন "বলি, সুশীল সুবোধ ছেলে, তাড়ি খাওয়ার পয়সাটি জোটালে কোথা থেকে ?"

কানু লাল টকটকে চোখ দুটো তুলে একবার তাকালো মাত্র।

মেজকাকী আবার বললেন "মিছিমিছি স্বপনের নামে লাগিয়ে ভাঙিয়ে লোকের কাছে নিজে সাধু সাজতে যাওয়া হয়েছিল কেমন ? ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ছে তো ? বল টাকা কোথায় পেয়েছিলি ?"

কানু আবার মুখ তুলে পরিস্কার গলায় উচ্চারণ করলো "আপনার আলমারী থেকে।"

আপনার আলমারি থেকে !

শুনে প্রথমটা চমকে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মেজকাকী।

যদিও সেই সন্দেহের বশেই জেরা করতে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু কানুর এ রকম স্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনে তিনি যেন থতমত খেয়ে গেলেন। আর ওদিকে তখনও দরজার পিঠে দাঁড়িয়ে থাকা সুধা শিউরে থরথর করে কেঁপে উঠলো!

উঃ কানু কী ছেলে! কী ছেলে!

যারা আত্মহত্যা করে হাতে ক'রে বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি লাগিয়ে, অথবা নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে, নয় তো নিজের বুকে ছুরি মেরে, কানু তাদেরি দলের?

স্তম্ভিত ভাব কাটিয়ে মেজকাকী তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন "কী! আমার সঙ্গে ঠাট্টা?"

"ঠাট্টা নয়। সত্যিই আপনার আলমারী থেকে টাকা আমি নিয়েছি!"

হঠাৎ তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মেজকাকী, দরজাটাকে টেনে বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিয়ে।

অর্থাৎ কানুকে বন্দী করে গেলেন তিনি। ভাবলেন ভয়েডরে বলে ফেলেছে, এইবার নিশ্চয় পালাবে! অতএব—

ঠিকই বলেছে সুধা, ঠিকই বলতো ফুলি "তোমাকে কেউ বুঝতে পারেনা কানুদা।" সত্যি কে বুঝবে কানুর মনের গতি কোন রাস্তা লক্ষ্য করে ছুটছে!

ক্ষণপরেই ঘরের বাইরে রীতিমত এক সোরগোল উঠলো।

অনেকের কথা, অনেকের গলার প্রশ্ন, অনেক মন্তব্য, অনেক ছি-ছিক্কার।

সব কিছু ছাপিয়ে মেজকাকীর গলা শোনা যাচ্ছে "আজ বলে নয়, ওই হতচ্ছাড়া শয়তান অনেকদিন থেকেই আমার আলমারী থেকে টাকা সরাচ্ছে। প্রায়ই দেখি টাকা কম। তবু কিছু বলিনা। ভাবি তপনের আদরের বন্ধু, কিছু বলতে গেলে আবার অপমানী হতে হবে, দরকার নেই। জানতাম একদিন হাটে হাঁড়ি ভাঙবেই। রাম! রাম! একেই বলে দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা!"

মেজকাকী চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর হঠাৎ কানুর ঘরের দরজাটা খুলে গেলো, আর বাড়ীর ঝি লালুর মা খ্যারখেরিয়ে উঠলো "ওগো বাছা চলো! বড়োবাবুর ঘরে তলব হয়েছে। তোমার কীর্ত্তি-কাণ্ডর বিচের হবে।"

"আমি যাবো না।"

"যাবে না! ই-স! না গেলে দরোয়ান দে' মারতে মারতে নে যাবে না? একেই বলে দুর্মতি! হুঁঃ! দিব্যি খাচ্ছিলে দাচ্ছিলে রাজার হালে ছিলে, সইলোনি। কুগ্‌গেরোয় ধরলো! ন্যাও চলো চলো।"

"চলো।"

কানু স্থির অচঞ্চল ভাবে ওর পিছন পিছন উঠে যায় দোতলায় বড়োকর্ত্তার ঘরে।

বড়োকর্ত্তা আলবোলার নল মুখ থেকে সরিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন "বোসো।"

কানুর মুখে হঠাৎ একটু বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো, সেই হাসির মধ্যেই বললো "বসবো কেন, দাঁড়িয়ে থাকাই তো উচিত আমার।"

বড়কর্ত্তা অলসভাব ত্যাগ করে উঠে বসে তীক্ষ্ণভাবে বললেন "কেন?"

"অভিযুক্ত আসামীরা কি বসবার অধিকার পায়?"

"হুঁ! বেশ বড়ো বড়ো কথা জানো দেখছি। তা' অভিযোগটা কি তুমি অস্বীকার করো?"

কানু সোজা সটান দাঁড়িয়ে পরিস্কার গলায় বললো "কোন অভি-যোগটার কথা বলছেন?"

"কোন অভিযোগ মানে?"

"আপনি তো আমাকে বিচার করবার জন্যে ডেকেছেন শুনলাম, আমার নামে কি কি অভিযোগ উঠেছে শোনেন নি?"

বড়োকর্ত্তা এমন কথাবার্ত্তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। ভেবেছিলেন ছেলেমানুষ দুর্মতির বশে, কুসঙ্গে পড়ে করে ফেলেছে কিছু অন্যায়, ডেকে ধমকে দেবেন, ভবিষ্যতে যাতে আর এমন না করে শাসিয়ে রাখবেন। ব্যস! ত'াতে কাজও হবে, আবার বড়োকর্ত্তার ক্ষমা করার মহত্ব দেখে সবাই অবাকও হবে। টাকাটা যদিও মেজকর্ত্তার ঘরের, কিন্তু বড়োকর্ত্তাই তো বাড়ীর প্রধান!

কিন্তু একি?

এ যে ফণাধরা কেউটে!

বড়োকর্ত্তা অতএব গম্ভীরভাবে বলেন "হ্যাঁ শুনেছি বৈ কি, অস্বীকার করতে পারো তুমি মদ খেয়েছো?"

"পারি" বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় কানু "নিশ্চয় অস্বীকার করবো।"

"বটে! তা'হলে মাতলামিটা?"

"মানুষ কতো কারণে বিচলিত হ'তে পারে। হঠাৎ মাতলামি বলে ধরে নিতে হবে কেন? কেন মানুষের সম্বন্ধে মানুষের এমন হীন ধারণা বলতে পারেন?"

বড়োকর্ত্তা মিনিটখানেক ভুরু কুঁচকে থেকে বললেন "হুঁ! তা' হঠাৎ এতো বিচলিত হবার কারণ?"

হয়তো সেই মুহূর্ত্তেই যদি কারণটা খুলে বলতে পারতো কানু, যদি বলে ফেলতে পারতো নিজের জীবনের ইতিহাস, ভগবান সম্বন্ধে তা'র বিরূপ মনোভাবের মূল কাহিনীটা, তা'হলে হয়তো সঙ্গেসঙ্গেই ক্ষমা পেয়ে যেতো! হয়তো 'আহা বেচারী' বলে সহানুভূতিও করতো কেউ কেউ। কিন্তু তা' হোলো না। কানুর বুদ্ধির গোড়ায় শনি তাকে তা করতে দিলো না।

তার বদলে তাকে বলালো "সে কথা জেনে আপনার কোনো লাভ হবে না। আমার কথা যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় করুন, ইচ্ছে না হয়, যা ভাবছেন তাই ভাবুন।"

বড়োকর্ত্তা একবার ব্যঙ্গ মিশানো কঠোর দৃষ্টিতে তপনের দিকে তাকালেন, ভাবটা যেন, 'বাঃ কী সুন্দর বস্তুটিকেই পুষেছো।'

তারপর তেমনি ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন, "বেশ, না হয় বিশ্বাসই করলাম তোমার কথা, কিন্তু আরো একটা অভিযোগ তো তোমার নামে রয়েছে হে!"

"চুরির তো? হ্যাঁ চুরি আমি করেছি।"

"বাঃ বাঃ বাঃ!" ছোটকর্ত্তা বলে ওঠেন "এ যে একেবারে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির দেখছি! তা বাপু চুরি করে তো কেউ কখনো বলে বেড়ায় না, তোমার হঠাৎ এ সৌখিনতা কেন?"

"আমি ওই রকমই।"

সতেজ জবাব দেয় কানু।

বড়োকর্ত্তা এবার গম্ভীর ভাবে বলেন, "নিজেই যখন স্বীকার করছো তখন জেরার খাটুনিটা আমার কমে গেলো। কিন্তু কথা হচ্ছে নিলে কি ভাবে?"

"আলাদা চাবি দিয়ে খুলে।"

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মেজকাকী ফিসফিসিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। হ্যাঁ, বৌদের ভাসুরদের সামনে অমনি ফিসফিসিয়ে কথা বলার প্রথা ছিলো তখন। চেঁচিয়ে উঠে বলেন মেজকাকী "উঃ কী শয়তান! কী শয়তান! এতোখানি বয়সে এমন পাকা বদমাইশ ছেলে কখনো দেখিনি!"

"দেখেননি, দেখুন।"

তপন আর চুপ করে থাকতে পারে না, ক্রুদ্ধভাবে বলে ওঠে "কানু চলে যা তুই।"

বড়োকর্ত্তা ধমকে ওঠেন "না চলে যাওয়া হবে না! জানতে চাই, আলাদা চাবি পেয়েছিলো কোথায়?"

কানু এবার চারিদিকে তাকায়।

আশে পাশে বাড়ীর সবাই বসে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ মজা দেখতে এসেছে সকলেই। চোখ পড়লো স্বপনের মুখের দিকে। ছাইয়ের মতো পাঙাস হয়ে উঠেছে তার মুখ। নিশ্চয় ভাবছে এখুনি কানু কী বলে বসে! চাবির কথা যখন বলছে, তখন নিশ্চয়ই স্বপনের ড্রয়ার থেকেই নিয়েছে। স্বপন নিজে অস্বীকার করলেই বা উপায় কি! সুধাটা আজকাল যা গোঁয়াব হয়েছে, ঠিক ফস্ করে সত্যি কথা বলে দেবে! হঠাৎ ওকে আজকাল যেন 'সত্যিকথা'য় পেয়ে বসেছে।

কী বলে কানু!

কী ব'লে বসে!

অবাক! অবাক! কানু বলছে "আলাদা চাবি আমি তৈরী করিয়েছিলাম।"

"তাই না কি! ওঃ! একেবারে পাকা চোর! সেই জন্যেই রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছিলে, বাড়ীতে ঠাঁই হয়নি। আমাদেরই অন্যায় হয়েছিলো কিছু না জেনে শুনে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া! যাক্ যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!...তপন তোমার বন্ধুকে পুলিশের হাতে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

পুলিশ!

সবাই একেবারে আচমকা চমকে উঠলো। পুলিশ! এতোটা কেউ আশা করেনি। ভেবেছিলো দু'চারটে গালাগাল মন্দ করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বড়োজোর! যে চাবুকের মতো ছেলে, হাতেপায়ে পড়ে মাপ তো আর চাইবে না, অতএব এ বাড়ীর হাঁড়ির ভাত তা'র এবার বন্ধ হলো!

কিন্তু পুলিশ!

বড়োকর্তা কিন্তু সেদিন অনমনীয় ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমাদের মতো ছেলেকে সমাজে চরতে দেওয়া পাপ, অন্যায়! আমি যদি শুধু তোমাকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলি, সেটা

হ'বে আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলার অপরাধ। পুলিশের হাতে সমর্পণ করে তবে আমার ছুটি।"

বড়োকর্ত্তার এ আক্রোশ যেন কানুর ওপরে নয়, আক্রোশ নিজের ছেলের ওপরে! যেন অনেকদিনের অনেক অপদস্থ হওয়ার শোধ আজ মিটিয়ে নিতে চান তিনি।

তপনের বন্ধু পুলিশে যাওয়ার যোগ্য!

যে বন্ধুকে সে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার শিক্ষার জন্যে এই ঘটা কয়েক আগেও বাপের কাছ থেকে টাকা এনেছে, বাপকে মর্মান্তিক কথার বাণে বিঁধে।

তপনের পক্ষে এর চাইতে লজ্জার আর কি হ'তে পারে!

হ্যাঁ, চিরদিনের উদ্ধত ছেলের মাথাটা সেদিন হেঁট হয়েছে।

তা'নইলে তপনের মতো ছেলে কোনো প্রতিবাদ না ক'রে মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়?

ছোটকর্ত্তা মুখ টিপে হেসে বললেন "কিন্তু হঠাৎ তোমার এতো টাকার দরকার হ'লো কেন বলোতো বাপু?"

"ভগবান জানেন!" তপনের মা ঠোঁট উল্টে বলেন "এ দিকে তপন তো ওর একজামিনের ফী জমা দেবার টাকার জন্যে তোমার দাদাকে যা নয় তাই বলে আদায় করলো!"

আবার ভগবান!

সবই যদি জানেন ভগবান, তা'হলে কানুর মনের জ্বালাটার কথা কেন জানতে পারেন না তিনি? কেন শুধু শুধু কানুর এতো কষ্ট?

হঠাৎ জীবনে কখনো যা না হয়েছে তাই হ'লো কানুর।

কানুর অজান্তে কানুকে আটকাবার চেষ্টা করতে সময় না দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো তা'র দুই চোখ দিয়ে।

আর "দিন দিন আমায় পুলিশে দিন, আমার জেল হো'ক, আমার ফাঁসি হোক, তাই চাই আমি—" এই কথা বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়লো কান্নু।

তা' কান্নু চেয়েছিলো বলেই হয়তো সেদিন জেল হয়নি কান্নুর। আসলে শেষ পর্য্যন্ত আর ওকে পুলিশে দেওয়ার মতো উৎসাহ খুঁজে পাননি বড়োকর্ত্তা। এমন কি কান্নুকে থেকে যেতেও অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন "সব সময় বড়োদের মুখের ওপর চোটপাট করতে নেই হে, ওর মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। ওটা একটা ছোলো ক্যাসান! যাক্‌গে যা হয়ে গেছে গেছে, এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করো, জীবনে উন্নতি করার চেষ্টা করো। তা' যদি পারো সেটাই বাহাদুরী।"

কিন্তু তবু থাকতে পারেনি কান্নু।

মেজকর্ত্তা বলেছিলেন "তা'হলে এর পর থেকে আমার ঘরের দরজায় একটা দারোয়ান বসাবার খরচ বাড়াতে হবে দেখছি।"

মেজকাকী বলেছিলেন "আমার ছেলেমেয়েদের অগত্যা তাদের মামার বাড়ীতে রেখে মানুষ করতে হবে। চোরের সঙ্গে এক বাড়ীতে ছেলে রাখতে পারবো না বাবা!"

ছোটকাকী বলেছিলেন "থাকে তো চাকরদের ঘরে থাকুক এবার থেকে। যেমন ওর প্রবৃত্তি!"

আর তপন শান্ত গম্ভীর গলায় বলেছিলো "দয়া করে তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কইতে এসো না কান্নু! না, তুমি শুধু অপরের বাক্স থেকে কয়েকটা টাকা নিয়েছো বলেই তোমাকে ঘৃণা করছি না আমি, আমি তোমায় ঘৃণা করছি তোমার বোকামীর জন্যে। যে সংসারে থেকে তুমি নিজেকে মানুষ করে তুলতে পারতে, সেখান থেকে তুমি কুকুরের মতো বিতাড়িত হচ্ছো কেবলমাত্র বুদ্ধির দোষে। মদ না খেয়ে যারা মাতলামী করে বসে কেলেঙ্কারী ঘটায়, তাদের আমি ঘৃণা করি।"

এর পর কি আর কেবলমাত্র বড়োকর্ত্তার অনুরোধটুকু সম্বল করে সে বাড়ীতে টি'কে থাকা যায় ?

বেত খাওয়া কুকুরের মতোই ছটফটিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলো কানু এক বস্ত্রে। আর ঈশ্বর জানেন কার শিক্ষায় তখন বাড়ীর খুব বাচ্চা ছেলেগুলো ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে দিয়ে আওড়াচ্ছিলো—

"চোর হয়ে বাড়ী যায়—
ব্যাঙ্ পুড়িয়ে ভাত খায়।
সে ব্যাঙটা পচলো—
পান্তাভাতে মজলো।"

ওদের কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ীর ছোঁড়া চাকরটা হাসছিলো দাঁত বার করে।

তখন প্রায় ছুটেই পালাতে থাকে কানু ওই হাততালির এলাকা থেকে। আর অনেকটা যাবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় বামুনঠাকুরের ডাকে।

কানুর ছোট টিনের সুট্‌কেসটা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে সে।

হ্যাঁ, এ বাড়ীতে এসে একটা সুটকেস জুটেছিলো কানুর। জুটে-ছিলো ভদ্রসমাজে চলে ফিরে বেড়াবার মতো কিছু কাপড়জামা। আর সঞ্চিত হয়েছিলো কয়েকখানি পড়ার বই—তার প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার ভেলা স্বরূপ।

"এটা ফেলেই চলে যাচ্ছো যে দাদাবাবু, এতো রাগ!"

কানু একবার ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে আবার চলতে সুরু করে হন হন ক'রে।

ঠাকুর কিন্তু নাছোড়।

"নিয়ে যাও দাদাবাবু, নইলে সুধা দিদিমণি আমায় বকবে। দিদিমণিই বললে, "কানুদা রাগ করে চলে যাচ্ছে ঠাকুর, কাপড়চোপড় সব ফেলে রেখে, ছুট্টে দিয়ে এসো।"

"আমি নেবো না।"

বলে ফের চলতে সুরু করে কানু।

ঠাকুরও কিন্তু ফের দৌড়য়। বলে "না নিয়ে আর কি হবে, সঙ্গে তো দ্বিতীয় বস্তরখানা পর্য্যন্ত নেই, এরপর পরবে কি ?"

"সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?"

"আমার আবার কি দরকার দাদাবাবু! গরীবের ছেলে পেটের দায়ে খাটতে এসেছি, যে যা হুকুম করবে পালতে হবে। সুধা দিদিমণিটিকে তো চেনো ? হুকুম না পাললে রক্ষে রাখবে ? তোমার বই খাতা রয়েছে এতে—"

কানুর মনটা কি একবারের জন্যে লোভে দুলে ওঠেনি ? মনে হয়নি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয় সুটকেসটা ? অন্ততঃ বইগুলোর জন্যেও ? যে পরীক্ষার জন্যে এতো কাণ্ড, সেই পরীক্ষাই তো দেওয়া হবে না বইগুলোর অভাবে।

তবু—

তবু পারেনি কানু হাতটা বাড়াতে।

বাধা! অদ্ভুত একটা বাধা!

সে বাধা কানুর নিজের মনেরই পাথরের টুকরো দিয়ে দিয়ে তৈরি পাহাড়।

সে পাহাড় ঠেলে ফেলে দেবার ক্ষমতা আজ আর নিজেরই নেই কানুর।

নীল, খয়েরি, আর কালো ডোরা টানাটানা কয়েকটা সার্ট আর খানকয়েক মোটাসোটা ধুতি! সুটকেসটায় আজও তেমনি সাজানো আছে, আছে সুধার ঘরের খাটের তলায়। শুধু বইগুলো—

কিন্তু সে তো অনেক দিন পরের কথা।

তখন কানু শুধু ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাবে। লোভের জগৎ থেকে, নিষ্ঠুরতার জগৎ থেকে, আবার সহানুভূতিভরা ভালোবাসার জগৎ থেকেও।

এতোবড় পৃথিবীতে কানুর কোন আশ্রয় নেই।

কানু যেন একটা অভিশপ্ত জীব!

আবার পথ!

আবার খোলা রাজরাস্তা! সে রাস্তায় শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ানো —খিদের, তেষ্টায়, রোদে ঝলসে!

রাস্তার কলের জলে আর কতোটুকু শান্তি মেলে? খালি পেটে রোদে ঘুরে ঘুরে শুধু জল খেলেই বা ক'দিন শরীর টেঁকে?

অবশেষে একদিন হাসপাতালে যেতে হয়েছিলো কানুকে, কলেরায় আক্রান্ত হয়ে।

পথে পড়ে ছিলো অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে, কর্পোরেশনের গাড়ী এসে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো।

সেখানে, যখন জ্ঞান হলো সে এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা! সেবার, যত্নের, অথচ নিষ্ঠুরতার!

কতো মমতাশূন্য হয়ে, কতো নিপুণভাবে সেবা করা যায়, হাসপাতাল যেন তার দৃষ্টান্তস্থল।

ঘড়ি ধরে ঔষধ, ঘড়ি ধরে খাদ্য, নিয়মিত পদ্ধতিতে জ্বর দেখা, গা মাথা মোছানো—কলের মতো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলো দিকি 'যন্ত্রণায় আমার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, একটু টিপে দেবে গো?' দেবে না। উল্টে ধমকের চোটে মাথার যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে।

সেই বিরাট 'হল', সেই অনেকের ব্যবহারে ব্যবহারে মলিন বিবর্ণ বিছানা, সেই পাশাপাশি অনেক অনেক রোগী, আর তাদের রোগ যন্ত্রণার কাতরোক্তি·····এখনো যেন অনুভবে আসে কানুর।

অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলে তো আসেই। তাই না এখন হাসপাতালের উন্নতির জন্যে—কিন্তু সেকথা এখন থাক্। চৈতন্য আর অচৈতন্যের

মাঝামাঝি একটা ঝাপসা ঝাপসা জায়গা, তা'র মাঝখানে শুধু একটা অসহায় অনুভূতি—ক্লান্ত কাতর ভারাক্রান্ত!

সেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে যা এই এক বছরের মধ্যে করেনি কানু তাই করতে থাকে, যেন নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

স্মৃতির রোমন্থন! মনকে ছেড়ে দিয়ে শুধু ভাবা!

তপনদের বাড়ীতে থাকতে যখনই বাড়ীর কথা, পুরনো জীবনের কথা মনে পড়ে গেছে, তখনই জোর করে সে চিন্তার গলা টিপে ধরেছে কানু। না না, কিছুতেই মনে আসতে দেবে না সে, ওর সেই ফেলে আসা জীবনকে!

ওর কেউ নেই, কেউ ছিলো না!

এই শেষ কথা!

কিন্তু হাসপাতালের ঘরে বুঝি দুর্ব্বলতার সংক্রামকতা আছে। শারীরিক দুর্ব্বলতার নয়, মানসিক। তাই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে কানু। এখানে এই চৈতন্য আর অচৈতন্যের আলো-আঁধারি ত দেহটাকে ফেলে রেখে কানুর আত্মা অনেকটা ব্যবধান ঘুচিয়ে চলে যায় সেই ছোট্ট মফস্বলি টাউনটায়।

না চড়া কড়া সহর, না ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধবহা গ্রাম।

গ্রাম আর সহরের মধ্যবর্ত্তী সেই ধূলো-ওড়া পাকা রাস্তায়, আর গরুচরা খোলা মাঠে, ছোট বড়ো দোতলা বাড়ীর ধারে ধারে, আর বন-বাদাড়ের ঘন গভীর ছায়ায় ছায়ায় খালিগায়ে মালকোঁচা মেরে শুধু এক-খানা কাপড় পরে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় কানুর আত্মা।

সে আত্মা ঝড়ের দিনে আম কুড়িয়ে কোঁচার পুটলিতে বয়ে এনে বাড়ীর উঠোনে ঢেলে দেয়, শরতের ভোর ধামায় করে শিউলী ফুল কুড়িয়ে মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ীর দাওয়ায় এনে ধরে দেয়—একখানি উৎফুল্ল মুখ, একজোড়া সপ্রশংস দৃষ্টি আর এক টুকরো উল্লসিত হাসির সামনে।

সে আত্মা অধীর আগ্রহে 'পাগলাবাবার' আশ্রমের উদ্দেশে হেঁটে হেঁটে পায়ে, আর বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে 'চু কিৎ কিৎ' খেলতে পায়ে, ব্যথা ধরায়।

সে আত্মা স্কুলে মাষ্টারের প্রশ্নে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উঠে চট্‌পট্‌ নির্ভুল জবাব দেয়। আবার বছরের শেষে প্রমোশনের দিন প্রথম পুরস্কারগুলি লাভ করেও নির্বিকারভাবে 'অফিস রুমে' ফেলে রেখে দিয়ে খেলতে চলে যায় অনেকক্ষণের জন্যে।

কবে যেন একদিন নিজে হাতে তৈরী ছিপ্‌ ফেলে মাছ ধরেছিলো না কানু? ধরেনি, ধরতে গিয়েছিলো 'পাড়ুই'দের ভাঙাভিটের পিছনের ডোবায়।

মশার কামড়ে গা ফুলে ওঠে, পায়ের কাছে ব্যাঙ লাফায়, তবু একটা মাছ অন্ততঃ ধরবেই পণ করে বসেছিলো পড়ন্ত বিকেল অবধি। সেখানে কেমন করে যেন ফুলি এসে হাজির।

ফুলি এসে হেসেই কুটিকুটি।

"একী কানুদা, এই পচা ডোবায় মাছ ধরতে এসেছো তুমি? হি হি হি! এখানে কে 'পোনা' ছেড়ে মাছের চাষ করছে? এখানে তো শুধু বাগদীপাড়ার লোকেরা এসে বাসন মাজে।"

ফুলির সামনে ব্যর্থতার এই শোচনীয় প্রকাশে রাগে আগুন হয়ে উঠেছিলো কানু, আর মটমট করে ছিপটা ভেঙে জলে ফেলে দিয়ে বলেছিলো "লক্ষ্মীছাড়ার মত হি হি করে হাসছিস যে? মাছ ধরিনি নাকি? অনেক ধরেছি। ধরে ধরে আবার পুকুরে ছেড়ে দিয়েছি। কী হবে অসময়ে বাড়ীতে মাছ নিয়ে গিয়ে? পিসি তো চেঁচাবে রাক্ষুসীর মতো!"

ফুলি দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিলো, "তা'নয় আমাদের উঠোনে ফেলে দিয়ে যেতে? আমি তো আর চেঁচাতাম না?"

"তোকে দেব? কেন? তোকে আহ্লাদ করে মাছ ধরে খাওয়াতে যাবার কী দায় পড়েছে রে আমার? সেও তো জলে ফেলে দেওয়াই।

তার চেয়ে জলের জীব জলে ছেড়ে দিলাম চুকে গেলো।" বলে হন্ হন্ করে চলে গিয়েছিলো কানু—ফুলি এমন সময় এখানে কেন, এ প্রশ্ন না করেই।

এখন সেই ডোবার ধারে ঘুরে বেড়ায় কানুর দেহচ্যুত আত্মা বেদনা কাতর মুখে। চুপি চুপি ফুলিকে জিজ্ঞেস করতে চায়, 'এমন সময় তুই এখানে কেনরে? আমায় খুঁজতে বুঝি?'

পিসির কথাই কি মনে পড়ে না?

তাও পড়ে বৈ কি।

রাসমণির তো ভাইপোর ওপর ভালোবাসার অভাব ছিলোনা, শুধু সেই ভালোবাসার পদ্ধতিটা কানুর অপছন্দকর ছিলো। তবু এখন মনে পড়ে মন কেমন করে।

আর মা?

সেই বেচারী বেচারী রোগাদড়ি মানুষটা! তা'র ওপর কি কম দুর্ব্যবহার করেছে কানু? কিন্তু—

হঠাৎ দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে—হাঁসপাতালের বিছানায় শোওয়া ছেলেটার দু'চোখের কোণ বেয়ে।

শুধু যদি—বাবা আর কাকা অতো শয়তান না হ'তো!

কানুর ভাগ্যে হাঁসপাতালও সইলো না।

ভালো করে সেরে ওঠবার আগেই তাড়িয়ে দেওয়া হলো তাকে।

অপরাধ?

অপরাধ, কানু একটা নার্সের মুখের ওপর বার্লির গেলাস ছুঁড়ে মেরেছে। কিন্তু কেন মেরেছে? নার্সের কি অপরাধ? সে কথা কেউ জানতে যায়নি। নার্স-ই রসাতল করে বেড়িয়েছে দোতলা থেকে একতলা, এ ডাক্তারের কাছ থেকে ও ডাক্তারের কাছে।

কানু যে একশোবার করে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছে—ডাক্তার থেকে জমাদার পর্য্যন্ত—তা'র জলের কলসীটা ভেঙে গেছে, কা'ল থেকে জল খেতে পায়নি সে, সে কথায় কি কান দিয়েছে কেউ? তেষ্টায়

ছাত্তি কেটে যাচ্ছিলো, তখন কিনা বালি ! তবু তো রাগ চেপে ফের আবেদন জানিয়েছিলো কানু। নার্স কান দেয়নি, উল্টে ধমক দিয়েছে। কান দিতো, যদি পয়সা থাকতো কানুর কাছে—যদি একটা কোন আত্মীয়ও দেখতে আসতো কানুকে !

কানু যেন রাস্তার ভিখিরি !

কিন্তু ওদেরই বা দোষ কি ? ভিখিরির মতোই তো রাস্তা থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছিলো ওরা।

এখন—এই বয়সের অভিজ্ঞতায়, পৃথিবীকে দেখে দেখে শক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে কানু—ওরা যা করেছিলো সেটাই স্বাভাবিক। পথের জঞ্জালকে আবার মানুষ বলে গণ্য করে কে ?

কিন্তু তখন বোঝবার ক্ষমতা ছিলো না।

তাই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বার্লির গেলাশটাই—

তবু যে ওকে কোনো শাস্তি না করে ওরা এমনি ছেড়ে দিয়েছিলো, এই তো যথেষ্ট !

তপনের বাবাও তো শাস্তি দেননি শেষ পর্য্যন্ত।

না, বরং দোষ করে শাস্তি পায়নি কানু, শাস্তি পেলো অকারণে। শুধু ছেঁড়া ময়লা কাপড়জামা পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো ব'লে, শুধু পাহারাওলার প্রশ্নের ঠিকমতো জবাব দেয়নি ব'লে, কানুকে হাজত যেতে হলো !

সেখানে ?

সে এক অলৌকিক কাহিনীর মতো।

অপর একজন হাজতবাসী, কি যেন নাম তার ? হ্যাঁ দিবাকর সিংহী। দিব্যি ফিটফাট বাবুর মতো চেহারা, চোখে সোনার চশমা। বললো, হাতে সোনার ঘড়ি ছিলো, পাহারাওলারা কেড়ে নিয়েছে।

হ্যাঁ, সে বললো এক অদ্ভুত কাহিনী !

সে নাকি নোট জাল করে।

ইচ্ছে মতো নোট ছেপে ছেপে হাজার হাজার টাকা করে সে। হাজার হাজার টাকা! কানুর চোখ জ্বলে ওঠে।

কেন কে জানে কানুকে তা'র ভারী পছন্দ হয়ে গেলো। অবিশ্যি সে ধরে নিয়েছিলো কানু পকেটমার। তাই বেশ বন্ধুর ভঙ্গীতে বললো "ওসব ছিঁচকেমি করে কোনো লাভ নেই হে! মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার, এই হচ্ছে পুরুষের কথা। আমার ব্যবসা দেখো, কারুর বাক্স ভাঙিনা, কারুর পকেট মারি না, মোটকথা কারুর কোনো ক্ষতিই হয় না, অথচ আমার হাজার হাজার টাকা হয়। এই দুনিয়াটা শুধু টাকারই বশ হে! টাকা থাকলে বিনা খাটুনিতে লাট-সাহেবের হালে থাকো—"

"আর এই যে ধরা পড়লেন— " কানু বলে।

"সে দৈবাৎ। তা'ও আমার অ্যাসিষ্টেন্ট ব্যাটার বোকামীতে! কতোকাল ধ'রে এ ব্যবসা চালাচ্ছি, কিছু হয়নি, আর ও ব্যাটা হঠাৎ বোকামী করে—সে যাক্। ভাগ্যে ওঠাপড়া আছেই। তা'বলে ভেবো না আমার ব্যবসা আমি ছাড়বো! কিন্তু একটা চালাক-চতুর ছেলে যোগাড় করতে পারলে ভালো হয়। তোমাকে দেখে আমার বেশ মনে ধরেছে! লেখাপড়া কিছু জানো?"

উত্তর প্রেত্যুত্তরের মধ্যে কানুর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় সংগ্রহ করে দিবাকর সিংহী বলেছিলো "তোমাকে গড়েপিটে নেবো আমি। এই রকম ছেলেই আমার দরকার, মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো! কিন্তু লেখাপড়া কিছু শিখতে হবে বাপু! লেখাপড়া না শিখলে কি আর জাল-জোচ্চুরী চালানো যায়? আমার সঙ্গে চলো। দু'একটা পাশ করে ফেলো—"

কানু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেছিলো "আমার সঙ্গে মানে? আপনি কবে জেল থেকে ছাড়া পাবেন তা'র ঠিক কি?"

কানু জানে সে নিজে নির্দ্দোষী, বিচারে ছাড়া পাবেই। কিন্তু ওই লোকটা?

"জেল থেকে ?" হো হো করে হেসে উঠেছিলো দিবাকর সিংহী। "জেলে যাচ্ছে কে ? মোটা টাকা জামিন দিয়ে দিব্যি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবো। তারপর বড়ো বড়ো উকিল ব্যারিষ্টার লাগিয়ে মামলা চালাবো, ঘুষ দেবো, ব্যস ! সোনার চাঁদ হয়ে সমাজের চূড়োয় বসে থাকবো। টাকা থাকলে কেউ ফাঁসাতে পারে না হে !"

অবিশ্যি এ জোর তা'র শেষ অবধি খাটেনি, কিন্তু সে অনেক— অনেক পরের কথা ! এখন মুগ্ধ হ'য়ে শোনে কানু এই বীরপুরুষের মন্তব্য।

"কী বলো রাজী আছো ? বলছো তো গত বছরেই পরীক্ষা দিতে, দেওয়া হয়নি। বেশ দিয়ে ফেলো এ বছর। তারপর ভালো কলেজে ভর্তি করে দিই। কেমিষ্ট্রি পড়ো, যাতে আমার ব্যবসার সুবিধে। তারপর দেখো না, তুমি একটি ছোট রাজা, আমি একটি বড়ো রাজা। মনে করো হাজার হাজার টাকা ঘরে বসে তৈরী করছো তুমি !"

শয়তানের মধুর ছলনা !

আনন্দে আগ্রহে বুক কেঁপে উঠলো কানুর। বড়োলোক হবার এর চাইতে সুন্দর উপায় আর কি আছে ?

"তা'হলে রাজী তো ? তোমার নাম যাই হোক, তোমাকে আমি 'মাণিক' বলে ডাকবো বুঝলে ? 'কুড়োনো মাণিক' !"

দিবাকর সিংহী বললেন "দেখলি তো মাণকে, কেমন গট্ গট্ করে বেরিয়ে এলাম ওদের নাকের সামনে দিয়ে ? বলিনি তোকে 'জেলে যাচ্ছে কে' ? বেশীর মধ্যে তোকে সুদ্ধু ছাড়িয়ে আনলাম।"

ঘণ্টা কয়েকের আলাপেই তুমি ছেড়ে 'তুই' ধরেছিলেন সিংহ মশাই।

কানু লাল লাল মুখে বললো "আমি তো ছাড়া পেতামই। আমি তো কিছু করিনি, আমাকে তো ভুল করে ধরেছিলো।"

"হা হা হা !"

অট্টহাস্য হেসে উঠলেন সিংহী। "ওই আনন্দেই থাক্। ওরে বাপু তোর হয়ে যদি লড়বার কেউ না থাকে তা'হলে দোষীই হ'স আর নির্দ্দোষীই হ'স ফল একই। ধরেছে যখন দিতোই জেলে পুরে। আসল কথা পৃথিবীটা হচ্ছে বলবানের জন্যে। দুর্ব্বলেরা পড়ে মার খাবে, বলবানেরা ড্যাঙডেঙিয়ে বেড়াবে, এর নামই আইন।"

আশ্চর্য্য!

কানুর মন থেকে ন্যায় আর নীতিবোধ ধুয়ে মুছে ফর্সা করে দেবার জন্যেই কি সমস্ত পৃথিবী ষড়যন্ত্র করে বসে আছে? যেন কোথাও কোনোখানে অবশিষ্ট না থাকে কিশোর মনের সৌকুমার্য্য, না থাকে চিরদিনের সংস্কারগত পাপ পুণ্য, সভ্য অসভ্য বোধ!

দিবাকরের ভেতরের ব্যবসা যাই হোক, বাইরের ব্যবসা হচ্ছে ফটোগ্রাফের। বড়ো রাস্তার ওপর দিব্যি একখানা ষ্টুডিও খুলে বসে আছেন ভদ্রলোক। যথেষ্ট পশার, দলে দলে লোক আসে ফটো তোলাতে। যে একবার আসে, সে বারবার আসে। কারণ মেজাজে খোলামেলা দিলদরিয়া লোক এই 'সিংহ ষ্টুডিও'র সিংহী মশাই।

কানু পরে ভেবেছে—অমন একটা লোক যদি জীবনের চলার পথে অমন একটা ভুল নীতি বেছে না নিতেন! কিন্তু তখন ভাবেনি তাঁর নীতিটা ভুল। পরম পুলকে সিংহী মশাইয়ের অসাধারণ বুদ্ধির তারিফই করেছিলো। ভেবেছিলো—সত্যি বড়োলোক হ'বার এই সহজ উপায়টা সবাই ধরে না কেন? যতো ইচ্ছে নোট তৈরী করো, যতো ইচ্ছে খরচ করো, ব্যস চুকে গেলো! কোথাও কারুর কোনো লোকসান করা হচ্ছে না।

ওর থেকে বেশী ভাববার মতো বুদ্ধি আর তখন ছিলো না কানুর।

তবু- সিংহীমশাইয়ের নীতি ঠিকই হোক আর ভুলই হোক—কানুর কাছে তিনি নমস্য। চিরদিনের জন্য নমস্য।

তাঁর দয়াতেই তো আজ কানু জীবনের পথে দাঁড়াবার সুযোগ

পেয়েছে ! তাঁর সঙ্গে দেখা না হ'লে, নিরুপায়তার কোন অতল সমুদ্রে তলিয়ে যেতে হ'ত কানুকে কে জানে !

ষ্টুডিওতে সহকারী, বাইরের জগতে ভাগ্নে।

হ্যাঁ, স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের কাছে দিব্যি স্বচ্ছন্দে পরিচয় করিয়ে দিলেন সিংহীমশাই—"এই নিয়ে এলাম আমার ভাগ্নেটিকে। গ্রামের স্কুলে ফার্ষ্ট ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছিলো, তারপর নানা অসুবিধায়—"

হেডমাষ্টার গম্ভীরভাবে বলতে যাচ্ছিলেন বছরের মাঝখানে ছাত্র ভর্ত্তি করা সম্ভব হবে না, সীট্‌ নেই। কিন্তু সিংহীমশাইয়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের এবং জোরালো কথার দাপটে তাঁর গাম্ভীর্য্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

"সীট নেই তো হয়েছে কি মশাই? একষ্ট্রা চেয়ার দিয়ে দেবেন একখানা। দেখেননি থিয়েটার বাড়ীতে বেশী ভীড় হ'লে কোথা থেকে না কোথা থেকে চেয়ার এনে যেখানে সেখানে বসিয়ে দেয়?"

হেড্‌মাষ্টারমশাই হেসে ফেলে বললেন "সীট মানে কি শুধু চেয়ার?"

"তবে আবার কি?"—দিবাকর দাবড়ানি দেন "চিরকালই তো তাই জেনে আসছি। স্কুলে না থাকে তো বলুন বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দেবো একখানা। তার না হয়তো কিনেই নেবেন একটা। এই যে"—পকেট থেকে দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে টেবিলে রাখলেন দিবাকর। তারপর মধুর হেসে বললেন "ওই হচ্ছে একষ্ট্রা চেয়ারের দাম। আর কি কি লাগবে বলুন চটপট। গত আট মাসের—মানে জানুয়ারী থেকে এই আগষ্ট অবধি মাইনে, স্পোর্টস্‌ ফী, পাখাভাড়া, পুওর ফাণ্ড, সরস্বতী পূজোর চাঁদা, বেয়ারার বকশীস, এসব তো জানাই আছে, আর যদি কিছু লাগে বলে ফেলুন, বলে ফেলুন।"

হাঁ করে তাকিয়ে দেখে কানু আর একগোছা দশটাকার নোট টেবিলে ফেলে দেন সিংহী নেহাৎ অবহেলা ভরে।

ওর নিজের তৈরী জিনিস!

কী মহিমা ! কী মহিমা ! বিগলিত হ'বার যেটুকু বাকী ছিলো কানুর তা' সম্পূর্ণ হয়। আর আশ্চর্য্য হয়ে দেখে হেড্‌মাষ্টারমশাই আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে কেরাণীবাবুকে ডাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভর্ত্তি করলেন কানুকে।

আরও দু'একটা কথা হয়, হেড্‌মাষ্টারমশাই দু'চারটে প্রশ্ন করেন কানুকে, এবং সন্তুষ্টও হন।

সতৃষ্ণনয়নে স্কুলবাড়ীটার দিকে তাকাতে তাকাতে ফিরে এসে সিংহীমশাইয়ের সঙ্গে গাড়ীতে ওঠে কানু।

"দেখলি তো ?"

আর একবার খুশীতে ফেটে পড়েন দিবাকর সিংহী। "বলিনি তোকে, জগতে বন্ধ দরজা খোলবার চাবি হচ্ছে টাকা !"

কানু বিহ্বলভাবে বলে "কিন্তু একটা চেয়ারের জন্যে অতো টাকা দিলেন কেন ? দশ বারো টাকাতেই তো একটা চেয়ার—"

"দূর হাঁদা !" কানুর পিঠটা চাপড়ে দিয়ে হেসে ওঠেন দিবাকর সিংহী "সত্যি কি আর চেয়ারের দাম ? ওর নাম হচ্ছে ঘুষ ! না দিলে কিছুতেই ভর্ত্তি করতে চাইতো না, নানান বায়নাক্কা করতো, পুরনো স্কুলের সার্টিফিকেট চাইতো, কতো কি ! এ একেবারে সব ভুলে গেলো ! কিন্তু তোর কথা তো কিছু বললি না আমাকে। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলি কেন, ছিলি কোথায় এতো দিন, বলবি বলেছিলি যে ?"

বলবে বলেছিলো, বলেও ছিলো কানু।

একমাত্র দিবাকর সিংহীর কাছেই বলেছিলো কিছু কিছু মনের কথা। দু'জনের বয়সের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকলেও, সুন্দর একটি বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিলো।

জীবনের নীতি গ্রহণের ভুল, যেন খেলাতে বসে 'চাল' ভুল ! নইলে দিবাকরের মতো দরাজপ্রাণ লোক জীবনে কমই দেখেছে কানু।

অতঃপর ঘুরে গেলো কানুর জীবনের মোড়। ভালো খাওয়া দাওয়া, ভালো জুতো জামা কাপড়, গাড়ী করে স্কুলে যাওয়া আসা, সে এক স্বপ্নময় অবস্থা !

ঠিক বড়োলোকের ভাগের উপযুক্তই চাল।

এ.তো দাক্ষিণ্য! অথচ নিতে কুণ্ঠা আসে না। কানুর মতো. ছেলেরও না।

দিবাকরের এই দেওয়ার মধ্যে তো দয়ার ছাপ নেই, আছে শুধু সহৃদয় বন্ধুর ভালোবাসা। তাই সহজেই নেওয়া যায়।

প্রথম বিভাগেই পাশ করলো কানু।

দিবাকর পিঠ ঠুকে দিয়ে বললেন "এই তো চাই। এখন ভাব বসে বসে, কোন কলেজে ভর্ত্তি হ'তে চাও?"

কলেজ!

সেই অজানা রহস্যময় রূপকথার পুরী! সেখানে প্রবেশাধিকার পেয়ে:ছ কানু। কিন্তু কলকাতা সহরটা কি এতো বড়ো? তাই দৈবাতের ভ্রমেও কখনো দেখা হয়ে যায় না পুরনো পরিচিতদের সঙ্গে? অথচ এই সহরটাতেই বাস করছে তপন, স্বপন, তা'দের বন্ধুরা। তারাও তো পড়ছে কলেজে। আর—বাস করছে সুধা আর তার বাপ কাকারা। কোনোদিন কখনো কি তাদের কাজ পড়তে নেই সহরের এ অঞ্চলে?

কিন্তু কাজ পড়ে কি হবে?

কানুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া এই তো? তা'তে কানুর লাভ?

তা' লাভ আছে বৈকি!

যারা কানুকে পথের ভিখিরির মতো তাড়িয়ে দিয়েছে বললেই হয়, তাদের কাছেই যদি কানুর এই গৌরবময় অবস্থা প্রকাশিত না হলো—

ভাবতে ভাবতে এক সময় চিন্তার গতি বদলায়।...কোথায় গৌরব? এও তো ভিখিরির অবস্থাই। এ অবস্থা—একজনের দয়ার দান বৈ তো নয়! দিবাকর যদি আজই তা'র ওপর বিমুখ হয়? কবে আসবে কানুর জীবনে সেই সত্যকার গৌরবের দিন, যখন কানু নিজের পরিচয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?

সে দিন কোন পথ ধরে আসবে?

উচ্চ শিক্ষার সাফল্যের পথ ধরে ? না জালনোট তৈরির সাফল্যের পথে ?

বুঝতে পারে না কানু। তবু দিবাকরের সহকারীর কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে লাগলো। দুপুরে কলেজ, সকাল সন্ধ্যায় পড়া, আর রাত্রে ষ্টুডিওর 'ডার্করুমে' বসে ফটো 'ডেভেলাপ' করার সঙ্গেসঙ্গে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাগজ তৈরির কাজ চলে। তারপর সে কাগজ নোটরূপে ছাপা হয় আরো গভীরতর গোপন একটি ঘরে।

সেখানে আরো দু'জন সহকারী আছে দিবাকরের। একজন হচ্ছে বোবা নেপালী যুবা, অপর জন হাঁটুর নীচে পা-হারানো একটা বর্মী প্রৌঢ়! ট্রেণ অ্যাক্সিডেণ্টে ওর দুটো পা-ই কাটা পড়েছে।

ঈশ্বর জানেন দিবাকর সিংহী এদের কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। বর্মীটা গুপ্তঘর থেকে আদৌ বেরোয় না, বোবা নেপালীটা দৈবাৎ বেরোয়। দিবাকরের ওদের সঙ্গে খুব দোস্তিভাব। যদিও কথাবার্ত্তা চলে সবটাই ইংরাজীতে।

দিবাকর একআধবার এ ঘরে আনে কানুকে, আর হেসে হেসে বলে "ছাখ, দেখে শিখে নে। তুই বেইমানের কাজ করবি না, অথবা বোকার মতো বেফাঁস কথা বলে ফাঁসিয়ে দিবি না এ বিশ্বাস রাখি। তুইই আমার ভবিষ্যতের ভরসা।"

কানু একদিন বলে ফেলেছিলো "কিন্তু অনেক তো টাকা করেছেন! আর কেন? বেশীর কী দরকার?" শুনে সে কী হাসি দিবাকরের! হাসি থামলে বলে "ওরে এখনো অবোধ শিশু আছিস, তাই একথা বলছিস। টাকা কখনো বেশী হয়? ও জিনিসটা যতো বাড়ে, ওর প্রয়োজনও ততো বাড়ে, বড়ো হ'লে বুঝবি।"

অথচ দিবাকরের স্ত্রী পুত্র নেই। লোকটা অবিবাহিত। আশ্চর্য্য! দু'হাতে টাকা ছড়াতেই যেন ওর চরম আনন্দ!

তা' কানুও দু'হাতে টাকা ছড়াতে পারে। কলেজে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোতেই হোক, দলবেঁধে সিনেমা থিয়েটার দেখতেই হোক, অথবা

কলেজের কোনো চাঁদার ব্যাপারেই হোক, কানুর ভূমিকা একেবারে প্রধানের। কানু নিশ্চয়ই সকলের খরচ একলা দেবে।

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে "যাই বলিস ভাই, দিব্যি একখানা মামা বাগিয়েছিস! আবার শুনি নাকি নিজের মামা নয়। লাকী ম্যান।"

আবার কেউ কেউ বা বলে "তোর মামার তো মাত্র একখানা ফটো তোলার দোকান, এতো পয়সা আসে কোথা থেকে বলতো?"

কানু গম্ভীরভাবে বলে "একদিন যাবি?"

"যাবো? কোথায় যাবো?"

"কেন মামার কাছে! নিজে মুখে জিজ্ঞেস করে আসবি—আচ্ছা এতো টাকা পান কোথায়?"

ওরা সামলে গিয়ে বলে "ধ্যেৎ।"

কানু বড়োলোক।

কানু গম্ভীর।

তাই কানুর বন্ধুর সংখ্যা কম। তবুও জুটেছিলো বৈ কি অনেক বন্ধু। জীবনের সেই তো সবচেয়ে আনন্দের কাল—সেই ছাত্রকাল!

কুনো কানুকে বন্ধুরাই মাঝে মাঝে জোর করে টেনে নিয়ে যেতো বেড়াতে—দলবেঁধে কোনো ছুটির দিনে বোটানিক্সে কি ডায়মণ্ডহারবারে, বেলুড়ে কি দক্ষিণেশ্বরে।

বেলুড়ের মন্দিরে তখনও মিস্ত্রীর কাজ চলছে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এতো বাজার বসেনি।

হঠাৎ এক শীতের দুপুরে!

সেই এক অদ্ভুত বোকামীর ইতিহাস খোদাই করা আছে কানুর জীবনের পাতায়।

বোটানিকসে পিকনিক ছিলো। ছাত্রদের আর অধ্যাপকদের মিলিত উল্লাসের আয়োজন। ওরই মধ্যে একটু দলছাড়া হয়ে কানু ঘুরছিলো এদিক ওদিক, এ গাছতলায় ও গাছতলায়।

হঠাৎ দুই চোখ ঠিকরে উঠলো কানুর।

ওদিকে কে ওরা? গাছতলায় উনুন জ্বেলে মহোৎসাহে রান্না চাপিয়ে হৈ হৈ করে গল্প করছে? ওর মধ্যে স্বপন আর তা'র বন্ধু রয়েছে না?"

হঠাৎ একজনের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলো কানুর। না, স্বপন নয়, তার এক বন্ধুর। আর সঙ্গেসঙ্গে দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলো কানু, কেন কে বলবে?

কানুকে যেন ভূতে তাড়া করেছে!

একেবারে বাগানের গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে তবে শান্তি! কানু যে একটা দলের সঙ্গে এসেছিলো, খাওয়াদাওয়ার সময় যে সবাই কানুকে খুঁজবে, এ রকম না বলে চলে আসার জন্যে যে অধ্যাপকদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এসব কথা তখন মনের কোণেও ঠাঁই পায় না কানুর, ওর তখন শুধু চিন্তা 'পালাতে হবে।'

এখনো মাঝে মাঝে ভাবতে গেলে নিজেই নিজের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ খুঁজে পায় না কানু। যাদের সঙ্গে দৈবাৎ কোথাও একবার দেখা হয়ে যায়না কেন ভেবে আক্ষেপের অন্ত ছিলোনা, তা'দের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে কেন এই উর্দ্ধশ্বাস দৌড়?

বাড়ীতে এসে দামী কাশ্মীরী শালখানা গা থেকে খুলে অবহেলায় চেয়ারের পিঠে ফেলে রেখে, মটমটে সার্জের স্যুটটা পরেই বিছানায় শুয়ে পড়ে কানু। যেন অনেক বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নিরাপদ আস্তানায় আশ্রয় পেলো!

দিবাকর সিংহী নিজে দোতলায় থাকেন, কানুর ঘর তিনতলায়। তিনতলায় ছোট ছোট দু'খানা ঘর, দু'খানাই কানুর। একটা ঘর পড়বার জন্যে সাজানো টেবিল, চেয়ার, বুককেস, সেল্ফ্ দিয়ে, আর একটা সাজানো শোবার ঘরের হিসেবে। জমিদারবাড়ীর ছেলের মতোই হাল কানুর।

সেদিন দিবাকর সিংহী কি কিছু সন্দেহ করেছিলেন কানুকে ? তা' নইলে কানু এসে শুয়ে পড়ার পরই কানুর ঘরে তাঁর আবির্ভাব ঘটলো কেন ?

দিবাকর ঘরে ঢুকতেই অবশ্য কানু উঠে বসেছিলো তাড়াতাড়ি। দিবাকর বলেন, "থাক্ থাক্ ব্যস্ত হবার কিছু নেই। শুনেছিলাম তোমাদের আজ পিক্‌নিক্ আছে, হঠাৎ চলে এলে যে ?"

"শরীর খারাপ লাগলো।"

হেঁটমুণ্ডে বলে কানু।

দিবাকর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, "শরীর খারাপ ? তোমার সিঁড়িতে ওঠা দেখে মনে হলো যেন পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটে পালিয়ে এলে!"

কানু নীরব।

"দেখ্ মাণিক, আমার কাছে কিছু লুকোতে চেষ্টা করিস্‌নি, আমার কাছে হাজার দোষের মাপ আছে, মিথ্যে কথার মাপ নেই।

হ্যাঁ, জালিয়াৎ দিবাকর সিংহী এই রকমই।

কানু হঠাৎ সমস্ত কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে বলে, "আগে যেখানে ছিলাম, বাগানে তাদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, তাই—"

"দেখা হয়ে গেলো তা কি ?" দিবাকর উদারভাবে বলে, "তুই তো আর সেখান থেকে চুরি করে পালিয়ে আসিসনি ?"

বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে, চোখের সামনে অন্ধকারের গায়ে শুধু কয়েকটা হলুদ রঙের ফুল !

আবার সামলে নেয় কানু। মুখ তুলে স্পষ্টস্বরে বলে, "তাইতো এসেছিলাম।"

"তার মানে ? চুরি করে পালিয়ে এসেছিলি ?"

"হ্যাঁ !"

আর কাউকে হ'লে বলতো কিনা কানু কে জানে, কিন্তু দিবাকর সিংহীর ব্যক্তিত্বের প্রতাপই আলাদা। সব কথা না বলে উপায় থাকে না।

সব কথা শুনে কিন্তু দিবাকর হেসে উঠেছিলেন, সেই ওঁর ঘর ফাটানো হাসি। "দূর দূর! নিলি তো সিন্দুক ফর্সা করে নে, তা নয় ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ! ধ্যেৎ! আবার চুরির টাকা তাদের ঘরেই লুকিয়ে রেখে এলি? এই তুই চালাক ছেলে?"

কানু অবশ্য নীরব।

একটু পরে দিবাকর বলেন, "আমার টাকা চুরি করলেও আমার কিছু এসে যাবে না, তবু বলে রাখি হে, না বলে চেয়ে নেওয়ার চাইতে বলে চেয়ে নেওয়াই ভালো।"

উঠে গিয়েছিলেন দিবাকর।

আর কাঠ হয়ে বসে ছিলো কানু।

হয়তো কানুর দুর্মতি তা'কে আবার ঘর ছাড়া করতো, কারণ সেদিন অনেকবার মনে হয়েছিলো কানুর 'পালাই পালাই'। আর যাতে না মুখ দেখাতে হয় ওঁকে। কিন্তু আসন্ন টেষ্ট পরীক্ষার বাঁধনই বেঁধে রেখেছিলো ওকে।

সিংহী মশাই অবশ্য আর তোলেননি সে কথা, তবে কানুর ওপর কাজ চাপাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। হয়তো দায়িত্বের বন্ধনে বাঁধতে চাইছিলেন তা'কে। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন এ ছেলে একটা শিকলিকাটা ময়না, একে আটকে রাখা শক্ত।

সন্ধ্যায় ষ্টুডিওর কাজে অনেক সাহায্য করতে হয় কানুকে। এক-আধ সময় ফটো তোলাও।

হঠাৎ একদিন আবার এক বিপত্তি।

নাঃ! কলকাতা সহরটা এমন কিছু বড়ো নয়।

ইয়া মোটা একটি ভদ্রলোক সকালে এসেছিলেন ষ্টুডিওতে। বললেন, "আমার একটি ভাগ্নীর ফটো তুলে দিতে হবে মশাই, যাতে কালো রং বেশ ফর্সা দেখায়।"

দিবাকর হেসে ফেলে বলেন, "কেন বিয়ের জন্তে ফটো চাই বুঝি?"

"ঠিক ধরেছেন মশাই! ফটো পাঠাতে হবে এলাহাবাদে, 'সম্বন্ধ' চলছে। বেশ আলো-টালো ফেলে—বুঝলেন তো?"

"ঠিক আছে, আনবেন ওবেলা। ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে।"

"আপনি থাকবেন তো?"

"আমি না থাকি, আমার এই এ্যাসিষ্টেণ্ট্ থাকবে।"

"এই সেরেছে! ও ছেলেমানুষ—মানে উনি ছেলেমানুষ, পারবেন?"

"খুব পারবে। একটু আধুনিক-টাধুনিকভাবে সাজিয়ে আনবেন মেয়েটিকে।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আর কানু বারবার ভাবতে লাগলো কোথায় যেন দেখেছে কানু এঁকে।

পরে বুঝেছিলো এঁকে দেখেনি, দেখেছিলো এঁর বোনকে। কারণ যে ভাগ্নীকে নিয়ে ফটো তোলাতে এলেন ভদ্রলোক, সে আর কেউ নয়—সে সুধা!

দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিলো নাকি কানু? ভাগ্যের একী পরিহাস? এ বোটানিক্যাল গার্ডেন নয় যে ছিট্‌কে পালাবে। অতএব?

অতএব না চেনার ভান।

সুধাও কি প্রথমটা পাথর হয়ে যায়নি? গিয়েছিলো বৈকি।

সে কি করে বিশ্বাস করবে এই দামী গরম সুট পরা লম্বা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারার তরুণটি তাদের বাড়ীতে পড়ে থাকা ছেঁড়াসার্ট পরা কানু? তবু চিনতে সে ঠিকই পেরেছিলো। অস্ফুটে উচ্চারণও করেছিলো 'কানুদা'।

কিন্তু কানুর যে তখন না চেনার ভানের পালা। তাই গলার স্বর ভারী করে বলেছিলো, "আমায় কিছু বলছেন?"

"আপনি—আপনি—মানে আপনার নাম কি?"

"আমার নাম—"

হঠাৎ ধমকে উঠলেন সুধার মামা—"ছবি তোলাতে এসেছিস ছবি তোলা, ওঁর নামে তোর কি দরকার রে?"

"না, না, তা'তে কি?" অমায়িক হাসি হাসে কানু, "আমার নাম অজিত মুখোপাধ্যায়।"

হ্যাঁ, ওই নামটাই তখন মুখে এসে গিয়েছিলো।

কিন্তু সুধা কি তা'তে ভুলেছিলো? মনে হয়না। তা'হলে বার বার অমন তাকাচ্ছিলো কেন? আর পরে ফটোর মুখটাই বা অতো বিষণ্ণ উঠেছিলো কেন?

তারপর ওরা চলে যাওয়ার পর—আরো অনেক দিন পর পর্য্যন্ত যখন তখন এই কথাটা মনে পড়েছে কানুর, তার মনটা সেই সুধার ছবির মুখের মতোই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। কী দরকার ছিলো ও রকম নিষ্ঠুরতার?

জীবন বসে থাকে না।

আজকের নিতান্ত দুঃখ পরবর্ত্তীকালে শুধু একটা অস্পষ্ট স্মৃতির ছাপ। জীবনে আসে নিত্য নতুন মুখ, নিত্য নতুন ভীড়। সে ভীড়ে হারিয়ে যায় পুরনো মুখ, পুরনো কথা। কিন্তু সব কি যায়?

কেন তবে কানুর মাঝে মাঝে কেবলই ইচ্ছে হয়, একবারের জন্যে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে বিশেষ একখানা টিকিট কিনে উঠে পড়ে ট্রেণে? না, কারো সঙ্গে দেখা করবে না কানু, শুধু বেড়াবে, শুধু একটা বাজে কোনো লোককে ধরে দেশের খবরাখবরগুলো জেনে নেবে। আর কিছু নয়।

হাতে টাকা থাকে সর্ব্বদাই, প্রচুর থাকে। দিবাকর সিংহীর তো ঢালা হুকুম—"দরকার হ'লেই সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে নিবি।" কাজেই ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়। কিন্তু—

কিন্তু যেন সাহসে কুলোয় না কিছুতে।

কেন এই ভয় ?

কিসের এই কুণ্ঠা ?

অহরহ ভাবতে থাকে কানু, সে তো আর কাউকে ধরা দিতে বা চেনা দিতে যাচ্ছে না, শুধু একবার জানতে যাওয়া। কেমন আছে তা'রা ? সেই তার সহপাঠিরা, তার মা, পিসি, মাষ্টারমশাই, ফুলি ? আচ্ছা ওরা কি এখনো স্কুলে পড়ে ? কেন তা' পড়বে ? আশ্চর্য্য তো ! ওদের দিনগুলো কি এগোচ্ছে না ? হয়তো—হয়তো ফুলির বিয়েই হয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বসে আছে, দেখাই হবে না।

এসব কথা মনে করতে করতে সহসা একদিন মন উদ্দাম চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিছুতেই বুঝি আর বেঁধে রাখা যাবে না নিজেকে।

যেতেই হবে। যেতেই হবে !

মনের মধ্যে অবিরত এই শব্দ ধ্বনিত হ'তে থাকে। অবশেষে দিবাকরকে বলেই বসে, "আমি দু'দিনের জন্যে একটু বাইরে যাবো"।

"বাইরে যাবি ? কোথায় যাবি ?"

না, দিবাকরের সামনে মিথ্যে কথা বলা যাবে না। কিছুতেই না। অনেকবার ভেবেছিলো বানিয়ে বলবে 'বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবো', পারলো না। চুপ করে রইলো।

দিবাকর সন্দেহ সন্দেহ ভাবে বললেন "কই বললি না ?"

"কোথায় যাবো জানি না।"

"কোথায় যাবি জানিস না ! জিজ্ঞেস করি আমি কালা, না তুই পাগল ?"

"বোধ হয় আমিই পাগল" মাথা নীচু করে বলে কানু।

"তাই দেখছি। কিন্তু বলতে তো হবেই বাপু, জানো আমার কাছে সাতখুনের মাপ আছে, মাপ নেই লুকোচুরির।"

"আমি—আমি—ভাবছি দেশে যাবো।"

"দেশে ?"

"হ্যাঁ"—মুখটা আরো নীচু করে বলে কানু "যেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

"যেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলি সেইখানে যাবি তুই? সেই-খানে যাবি? কেন? কেন?" হঠাৎ ভারী বিচলিত দেখায় দিবাকরকে, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলেন "বনের পাখী শিকলি কেটে কের বনে চলে যাবি বুঝি? কিন্তু আমি যে বড়ো আশা করেছিলাম রে —বড়ো আশা করেছিলাম।"

বিচলিত কানুও হয়েছে বৈ কি!

দিবাকর সিংহীর এ চেহারা অপরিচিত। কানু একটু কাতরভাবে বলে "আমি শুধু একবার দেখতে যাবো। রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়ে চলে আসবো।"

"সে কী অনেক দূর?"

"না না, এই তো মাত্র ঘণ্টা কয়েকের রাস্তা।"

"আচ্ছা যা। যদি তোর বাপ মা তোকে আটকায়, থেকে যাবি তো?"

"আমি তো তাদের সঙ্গে দেখাই করবো না।"

দিবাকর আবার পায়চারি করতে থাকেন, তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বলেন, "আমি বড়ো স্বার্থপর না?"

"না না, কেন?"

"কেন তা কি বুঝতে পারছিস না? ভয় হচ্ছে পাছে তোকে হারাই, তাই—আচ্ছা যা যা, শুধু যদি সেখানে থেকেই যাস একটু জানাস বাবা!"

হঠাৎ চোখটা ছলছলে দেখায় দিবাকরের।

আশ্চর্য্য!

এ রকম হবে তা তো ভাবেনি কানু।

ভাবলো দূর ছাই দরকার নেই যেয়ে।...আবার ইচ্ছে তীব্রতর হয়ে ওঠে। যেতেই হবে।

কানু তো আর সত্যি থেকে যাবে না!

শেয়ালদা !

শেয়ালদা !

উঃ কী সেই তীব্র আনন্দের যন্ত্রণা ! টিকিট চাইতে গলা কাঁপছে, টিকিট কিনতে হাত ! অদ্ভুত সেই অনুভূতি !

তারপর জীবনে কতো কতোবার রেলগাড়ী চড়লো কানু, কতো টিকিট কাটলো, কতোবার ট্রেণের হুইশ্ল শুনলো, কিন্তু সেদিনকার হুইশ্লের মতো তীক্ষ্ণ তীব্র ধ্বনি কি আর কখনো শুনেছে ? রেলগাড়ী চড়তে, টিকিট কিনতে, আর ট্রেণ আসার আগে প্লাটফর্মে পায়চারি করতে অনুভব করেছে সেদিনের মতো উত্তেজনা ?

কিন্তু তা'রপর ?

তা'রপর ফিরে আসার সময় কানুর মনের কাছে সমস্ত পৃথিবীটা কি একটা জমাট সীসের পিণ্ডের মতো নিথর হয়ে যায়নি ? সেই সঙ্গে কানুর হৃৎপিণ্ডটাও ?

কানু কি ভাবতে পেরেছিলো মাত্র এই ক'টা বছরের অবসরে সারা জগৎটাই ভয়ঙ্করতার নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠবে ?

কী ভয়ঙ্কর ! কী কুৎসিত !

কানুর সহপাঠিরা কেউ আর দেশে নেই, সবাই বাইরে ছিটকে পড়েছে, কেউ পড়ার জন্যে, কেউ চাকরীর চেষ্টায়। কানুর মা মারা গেছে, আর কানুর বাবা আবার একটা বিয়ে করেছে। কানুর পিসি রাসমণি নতুন ভাজের সংসারে থাকতে না পেরে চলে গেছে কাশী, আর—আর মাষ্টারমশাই মারা গেছেন সেই ক—বে ! তাঁর নাতনী ফুলি নিরুপায় হয়ে চলে গেছে তার পিসির বাড়ী—সে কোথায় কোন দেশে সে কথা বেচারাম বলতে পারে না।

বেচারাম গ্রামের ধোপা

তাকেই ধরেছিলো কানু ভর দুপুরে পুকুরপাড়ে। জানতো বেচারামই দেশসুদ্ধ লোকের খবর রাখে। সকলেই—হয় ওর, নয় ওর ভাই কেনারামের, খদ্দের।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এরা তো বদলায়নি।

এতোটুকু—এক তিলও না।

ওর সেই নীল রং গোলবার কানাভাঙা গামলাটা পর্য্যন্ত আজও তেমনি অবিকল আছে। তবে কেন পৃথিবীটা এতো বদলালো?

বেচারাম আক্ষেপ ক'রে বলে "সেই এলেই দাদাবাবু, যদি আর কিছুদিন আগে আসতে, তা'লে তোমার মা-টা একবার চোক্ষের দ্যাখা দেখতে পেতো! আহা, 'ছেলে ছেলে' করেই মা ঠাককণের প্রাণটা বেইরে গেলো।"

কানু হঠাৎ চোখে এসে যাওয়া জলকে প্রচণ্ড চেষ্টায় শুকিয়ে নিয়ে চীৎকার করে ওঠে "মিথ্যে কথা, কেউ কি আমায় খুঁজেছিলো?"

"আ কপাল! শোন কথা! জলজ্যান্ত একটা ছেলে নিখোঁজ হয়ে গেলো, খুঁজবেনি? কতো খুঁজেছে!"

"ছাই খুঁজেছে!" বলে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলতে থাকে নিজের বাড়ীর রাস্তার উল্টোদিকে।

বেচারাম হতভম্ব হয়ে ডাক দেয়, "এই রোদ্দুরে হন্‌হন্ করে আবার কোথায় চললে? বাড়ী গিয়ে চান আহার করে ওবেলা বেড়াতে বেইরো—"

কিন্তু বেচারামের কথার শেষটুকু আর বোধ করি কানুর কানে পৌছয় না।

কেনারাম খানিক দূরে কাপড় আছড়াচ্ছিলো, এদের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসে দাঁড়ায়। বলে "কী রে বেচা?"

"আর কও কেন দাদা! মিত্তিরঠাকুরদের সেই ক্ষ্যাপা ছেলেটা ফিরে এসেছে গো—"

"তাই না কি? হায় হায়! এতোকালে? তা তোকে কি বলছিলো?"

"কিছু না, এই সব খোঁজ তল্লাস নিচ্ছিলো, হঠাৎ কি যে হলো, রেগে কাঁই হয়ে হনহনিয়ে চলে গেলো।"

"মাথাটা বোধহয় একেবারেই বিগড়েছে।"

ব'লে কেনারাম নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে মন দেয়।

বেচারামও একটু তাকিয়ে থেকে শব্দ তোলে—ধাঁই ধপাধপ্, ধাঁই ধপাধপ্।

পরদিনই যখন কানু ফিরে আসে, সিংহীমশাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, কিন্তু ওর মুখ দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করেন না। ফিরে এসেছে এই ঢের।

ছেলেটাকে যে বড্ডোই ভালবেসে ফেলেছেন সিংহীমশাই। ভালো অবশ্য তিনি তাঁর বোবা আর পা-কাটা সহকারীদেরও বাসেন, কিন্তু সেটা অনেকটা স্বার্থের বশে। কানুর কথা আলাদা। কানুকে অকারণেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু কানু কি সে ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে?

নাঃ! কানুর বিদ্রোহী-আত্মা শুধু নিজের আগুনে নিজে জ্বলে জ্বলে খাক্ হ'তে জানে, শুধু অশান্ত উত্তেজনায় শূন্যে মাথাকুটে মরতে জানে।

তবু কানু পড়াশুনায় অদ্ভুত ভালো।

ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্র। তবে একরোখা আর অহঙ্কারী বলে অধ্যাপকদের তেমন স্নেহের পাত্র নয়। কী করে যে কানু এতো মানসিক অস্থিরতার মধ্যেও পড়ালেখাটা অমন নিখুঁতভাবে চালিয়ে এসেছিলো, এখন ভাবলে তা'র নিজেরই বিস্ময় জাগে। কিন্তু?

কিন্তু কানুর ভাগ্যাকাশে যে চিরদিনই শনি!

বি, এ, পরীক্ষার ঠিক আগেই সে শনি চাললো আর এক মোক্ষম চাল!

সেই এক ভয়ঙ্কর দিন !

কানুকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সিংহীমশাই ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন, কানু আসতেই কেমন এক রকম হেসে বললেন "লীলা খেলাটা সাঙ্গ হ'লরে মাণিক !"

কানু অবাক হয়ে তাকালো।

"আবার পুলিশে সন্ধান করে গেছে ! এবার আর ফসকে বেরিয়ে আসা যাবে না মনে হচ্ছে, এখনকার পুলিশ সুপার লোকটা বড়ো কড়া ! গোয়েন্দা লাগিয়ে যেখানকার যতো জাল জালিয়াতি কারবারের আড্ডা তচনচ্ করছে ! এবার আর সরে পড়া ছাড়া গতি নেই।"

আবার কেমন অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠেন দিবাকর সিংহী। কিন্তু সে কি হাসি ? না কান্না ? হঠাৎ শিউরে স্তব্ধ হয়ে যায় কানু।

দিবাকরের হাতে একটা রিভলভার।

"আপনি কী করতে চান ?"

চেঁচিয়ে ওঠে কানু।

সিংহীমশাই হেসে ওঠেন। "কি আর ? জালিয়াতের যা শেষ পরিণাম তাই !"

"আপনি কি সুইসাইড্ করতে যাচ্ছেন ?" কানু ছুটে গিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিতে যায়, কিন্তু দিবাকর সেটা সুকৌশলে অপর হাতে নিয়ে বলেন, "কি আর করা যায় ? এ বয়সে আর জেল খাটা পোষাবে না।"

"কেন, এখনো তো আপনার অনেক টাকা আছে"—কানু হাঁপায়, "আরো অনেক তৈরি করবেন, দিয়ে দিন না ওদের ?"

"সে আর হবে না।" দিবাকর তেমনি হাস্যমুখে বলেন, "সে চেষ্টা কি করিনি ভেবেছিস ? করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম পৃথিবীতে খাঁটি লোকও আছে রে ! আর হয়তো—" অন্যমনাভাবে বলেন দিবাকর—"হয়তো সেই জন্যেই পৃথিবীটা এখনো টিকে আছে। যাক্

এবারের মতো পৃথিবী থেকে বিদায়! ভেবেছিলাম তোকে দেদার টাকা দিয়ে আগেই এখান থেকে সরিয়ে দেবো, তুই অন্যত্র গিয়ে জীবন গড়তে পারবি। কিন্তু থাক্। তুই এমনিই চলে যা, শুধু হাতে! অন্যায়ের অর্থ মূলধন করে জীবন স্থরু করে কাজ নেই! এ পর্য্যন্ত তোকে ঢের কুশিক্ষা দিয়েছি, সে সব ভুলে যাস। মনে রাখিস সৎপথই সত্য পথ! ভাবছিস, হঠাৎ ভূতের মুখে রাম নাম কেন? তাই না? মরণের দরজার কাছে এসে আজ দৃষ্টিটা খুলে গেলো রে!"

"কে আপনাকে মরতে দিচ্ছে?" কানু হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায়—"তা'হলে তার আগে আমাকে গুলি করুন।"

"ক্ষ্যাপামি করিসনে মাণ্‌কে—" চেঁচিয়ে ওঠেন দিবাকর—"গুরুং সিং আর বাথিনও তোর মতন জ্বালাতন করেছিলো, ধমক দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছি।"

"বাথিন? তার যে দুটো পা কাটা!"

"ত'াতে কি? লোক দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। কলঙ্কিত টাকা গুলোর কিছু সদ্ব্যয় হ'লো!"

"ওদের বিদেয় করতে পেরেছেন, আমায় পারবেন না!"

"পাগলের মতো কথা বলিসনে মাণ্‌কে, যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার করতে আসতে পারে, তখন তুইও জালে পড়ে যাবি। তুই এইবেলা আমাদের কারখানা ঘরের চোরা দরজাটা খুলে বেরিয়ে যা।"

"না।"

"না? ফের না? না গেলে তোকে গুলি করে ফেলবো মাণ্‌কে!"

"তাই তো চাই। তাই করুন!"

হঠাৎ বিছানার ওপর বসে পড়েন দিবাকর। বসে পড়ে ক্লান্ত গলায় বলেন "তোকে আমি খুবই বেইমান ভাবতাম জানিস মাণ্‌কে! ভাবতাম ছোঁড়াকে এতো ভালোবাসি, ছোঁড়া তার এক ছটাকও প্রতিদান দিতে জানে না। পৃথিবী থেকে যাবার আগে অনেক ভুলই ভাঙছে রে!"

হঠাৎ নীচে একটা উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেলো। দিবাকরও উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "ওই বোধহয় পুলিশ এসে গেছে। দারোয়ান ব্যাটা বোধহয় আটকাতে চেষ্টা করছে। ব্যাটা বোকা! তুই যা বলছি মাণিক, যা শীগগির!"

"না!"

"ফের না? তার মানে আমায় জেল না খাটিয়ে ছাড়বি না?"

"তা' কেন? আপনিও চলুন না, সেই চোরা দরজাটা দিয়ে।"

"আমি?" হঠাৎ মুখটা কেমন উজ্জ্বল দেখায় দিবাকরের। "ঠিক বলেছিস, তবে এক কাজ কর, সিঁড়ির দরজাটা চট্ করে বন্ধ করে দিয়ে আয়। ওরা দরজা ভাঙতে ভাঙতে, আমরা বাথরুমের জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাতে পারবো।"

যতোই হোক তবু কানু ছেলেমানুষ। কী করে বুঝবে কানু, যে মুহূর্তে সে সিঁড়ির দরজার দিকে ছুটে যাবে, সেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিদারুণ সেই শব্দটা বিদীর্ণ করে দেবে সমস্ত পৃথিবীর স্তব্ধতা!

আর তার সঙ্গেসঙ্গেই শুনতে পাওয়া যাবে আর একটা শব্দ।

ভারী জিনিস পড়ে যাওয়ার।

না, যারা পুলিশী পরোয়ানা নিয়ে সেদিন দিবাকর সিংহীর বাড়ী চড়াও হয়েছিলো, তারা কোনো অপরাধীকেই ধরতে পারেনি। প্রধান অপরাধী চিরতরে ফসকে পালিয়ে গিয়েছিলো মানুষের গড়া আইনের হাত থেকে, আর দু'জন আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো নিরাপদ জায়গায়। আর শেষ অপরাধী সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে অনভ্যস্ত হাতে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলো বাথরুমের সিঁড়ি দিয়ে।

কে সেই দুঃসাহসের প্রেরণা জুগিয়েছিলো কানুকে? কে বুদ্ধি দিয়েছিলো আত্মহত্যার অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করতে? কে জানে!

বোধকরি পরিস্থিতিই প্রধান প্রেরণাদায়ক।

তারপর ?

তারপর—

জীবনের সে এক উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনাময় অধ্যায়!

অনেক ভাবলেও এখন কানু নিজেই কি আর বলতে পারবে কেমন করে সে খোলা দিনের আলোয় কলকাতার রাস্তায় রিভলভার নিয়ে দৌড়েছিলো, কেমন করে অজানতে বেপরোয়া ছুটতে ছুটতে সহরের খুব কাছাকাছি অথচ বনবাদাড় পুকুরে ভরা একটা অজানা জায়গায় গিয়ে পড়েছিলো, আর কেমন করে এখান থেকে ওখান, আর ওখান থেকে এখান লুকোচুরি করতে করতে শেষ অবধি একটা বিপ্লবীদের দলে গিয়ে ভিড়েছিলো ? না, কিছু বলতে পারবে না কানু। প্রবল জ্বরের সময় প্রলাপের ঘোরে যে সব কথা বলে মানুষ, সে সব কথা কি পরে মনে থাকে ?

মাথার মধ্যে তখন কি আর কিছু ছিলো জ্বলন্ত আগুন ছাড়া ? শুধু আগুন! তার উত্তাপে জ্বলে যাচ্ছে জ্ঞান, চৈতন্য, বুদ্ধি! জ্বলে যাচ্ছে জীবনের অন্য সব চিন্তা! সেই সময় সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের হাতে ধরা পড়লো কানু।

পরে অনেক দিন অনেক হাহাকারের মুহূর্তে—দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে মরে যাবার মতো ইচ্ছের মুহূর্তে—মনে হয়েছে কানুর, ওদের দলের হাতে না পড়ে যদি পুলিশের হাতেই ধরা পড়তো কানু! তা'হলে— তা'হলে তো কানুর জীবনের বনেদটা গড়া হতো না একটা রক্তাক্ত ভয়ঙ্করতা দিয়ে!

জেল হতো, হতো!

দিবাকর সিংহীর অন্নের ঋণ আর অযাচিত স্নেহের ঋণ শোধ হতো তাঁর বদলে জেল খেটে! কিন্তু এমন তো হতো না ? সে কথা ভাবতে গেলেই সব কিছু গুলিয়ে যায়, শুধু একটা দম আটকানো অনুভূতি, শুধু সামনে ভেসে ওঠে একটা জমাট কালচে গাঢ় রক্তধারা!

তবু সেই দম আটকানো অনুভূতির মাঝখানেও অনেকগুলো মুখ ফুটে ওঠে ঝকঝকে জলজলে। ওরা—ওই মুখের অধিকারীরা ভুল করে সর্ব্বনাশের পথ ধরেছিলো সত্যি, কিন্তু কানুকে তো তারা সত্যিই ভালোবেসেছিলো! ভালোবেসেছিলো ব'লেই তো টেনে নিয়ে গিয়েছিলো নিজেদের হাতে কাটা সর্ব্বনাশের রাস্তায়।

প্রথমটা বোধকরি কানুর হাতের রিভলভারটার লোভের আকর্ষণেই ওরা ধীরে ধীরে কানুর সঙ্গে ভাব করেছে, বন্ধুত্ব করেছে, করেছে দলভুক্ত। তারপর ভালোবেসেছে কানুর অনমনীয়তা, দৃঢ়তা, নির্ভেজাল খাঁটিত্ব, আর দুরন্ত বিদ্রোহ জ্বালাভরা প্রাণটা দেখে। এই তো চাই! এই তো দরকার!

এক এক সময় সব মুখগুলো এক সঙ্গে ভীড় করে আসে······ 'প্রভাতকিরণ' 'নিকুঞ্জ' 'বলাইদা' 'বড়দা' 'রোখা বরিশাল' 'হাঁদা যশোর' আর 'নীরজাদি।' নীরজাদির রক্তে আগুন, চোখে আগুন, কথায় আগুন! 'বড়দা' বাদে দলের সবাই তাঁর কথায় উঠতো বসতো। শুধু বড়দা হেসে বলতেন যখন তখন "সব আগুন যদি দলের মধ্যেই খরচ করে ফেলো নীরজা, সাহেবদের ল্যাজে লাগাবার জন্যে আর রাখবে কি? সাগর পার থেকে আসা ওদের ল্যাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েই তো ফের সাগর পার করে ছাড়তে হবে?"

ভাঙা দু'টো গাদা বন্দুক, আর গোটা তিন চার রিভলবার এই ছিলো ওদের অস্ত্রশক্তি! তবে বাক্যশক্তিতেই সব ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যেতো। বিদেশী শাসনের অবসানের জন্যে মরণ পণ করেছিলো ওরা। আর বক্তৃতার ঝাঁজে ফুটে উঠতো সেই মরণপণকারী রক্ত!

এর আগে কানু কোনদিন 'দেশ' নিয়ে ভাবেনি। ভেবে দেখেনি সে দেশ কার লৌহশৃঙ্খলে বন্দিনী। নিজের জীবনের অকারণ যন্ত্রণা দিয়েই কেটেছে বাল্য-কৈশোর, তারুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পেলো দিবাকরের

অগাধ দাক্ষিণ্য। যে কলেজে ভর্তি হলো, সেটি হচ্ছে বড়োলোকের 'বাবু' ছেলেদের কলেজ। সেখানে কেউ দেশোদ্ধারের স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর যদিও বা কেউ ঘামিয়ে থাকে, সে অন্যত্র, অন্য দলে। কানু তা'র সন্ধান রাখেনি। কানুর জীবনের একমাত্র চিন্তা ছিলো নিজেকে দাঁড় ক'রিয়ে তোলা! দেশের কথা ভাববার অবকাশ তা'র কবে জুটেছে?

এখানে এক নতুন চেতনা!

পরাধীনতা যে এতো গ্লানিকর, পরশাসন যে এতো ধিক্কারজনক, সে কথা কানু প্রথম টের পেলো এই "বিপ্লবী মুক্তি সমিতি'তে যোগ দিয়ে।

কিন্তু ওদের কাজ ধ্বংসাত্মক!

ওরা মুক্তি চেয়েছে, কিন্তু আপন শক্তির ওজন করেনি। বিবেচনা করেনি ওদের পথটা ঠিক কি ভুল। মহাত্মাজীর 'অহিংস মন্ত্র' ওদের কাছে হাস্যকর, ওদের শ্লোগান "রক্তের বদলে রক্ত চাই!"

ওদের কাছে আত্ম বিক্রয় করলো কানু!

ওরা বলে 'ধ্বংস করো, সব ধ্বংস করো। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল ভাঙো, তা'র শৃঙ্খলার যন্ত্রগুলিও ভাঙো! মারো পুলিশ, মারো লাট-বেলাট, ভাঙো তার ঘরবাড়ী অফিস আদালত, উপড়ে ফেলো তার শিল্পকেন্দ্রগুলি, জ্বালাও, পোড়াও, উৎখাত করো!'

কী সেই ধ্বংসের নেশা!

সেদিনের অনেকগুলো ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক কাজের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত থেকে গেছে কানু! কানু নয়, কানুর ভ্রান্ত আত্মা! ব্যাঙ্ক লুট করাকে ওরা ভাবে 'দেশের কাজ'! 'দেশের কাজ' মোটর ডাকাতি, পুলিশ খুন, সরকারী মজুতখানার চাল ডালের গুদামে আগুন লাগানো, রেল লাইনের ওপর বোমা ফেলে রেখে ট্রেন উল্টে দেওয়া! এই 'দেশের কাজ' করার উন্মাদ আনন্দে কানু ভুলে যায় তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান।

দিনের বেলা কোনো পোড়ো ভাঙাবাড়ীতে লুকিয়ে থাকা, কাঁচা পোড়া আধসিদ্ধ যাহোক্ কিছু খাওয়া আর ষড়যন্ত্র ভাঁজা এবং রাত হলেই দুষ্কর্ম্মের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়া, এই ওদের জীবনের ছক্ !

চোরের মতো, পশুর মতো !

কিন্তু পশুরাও কি এতো নৃশংস হ'তে পারে ? অকারণ এতো হিংস্র ?

একটা অখ্যাত গ্রামের এক দৈন্যদশাগ্রস্ত হাসপাতালের ঘরে, অচৈতন্য ফুলির খাটের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই কথাই ভেবেছে কানু ।

শেষরাত্রে লাইনে বোমা রেখে ট্রেন উল্টে দেবার পর, 'দেশের কাজে' অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় সেই নারকীয় নাটকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো 'প্রভাতকিরণ' 'নিকুঞ্জ' 'হাঁদা যশোর' আর কানু ! যে যতো টাকাকড়ি গহনা সংগ্রহ করতে পারবে, নীরজাদি তা'র উপর ততো খুসি হবেন। অতএব—

অতএব সেই মৃত্যুস্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো দরকার।

হঠাৎ কি মেঘ ডেকেছিলো ? না সে শব্দ কানুর বুকের ? হঠাৎ কি বিদ্যুৎ চমকেছিলো ? না সে দীপ্তি কানুর দৃষ্টির তীব্রতার ?

প্রথমটায় কি কানু বিশ্বাস করেছিলো যা দেখছে সেটা সত্যি ? কানুর চোখের ভ্রম নয়, শয়তানের নিষ্ঠুর পরিহাস নয়, একেবারে খাঁটি সত্যি ?

না প্রথমটায় বিশ্বাস করেনি। কিন্তু তারপর ?

লাইনের খানিকটা দূরে একটুখানি সোনার চকচকানি ! বারবার চোখ রগড়ে রগড়ে আর বারবার দেশলাই কাঠি জ্বেলে জ্বেলে দেখে অবিশ্বাসটাই যেন শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে বিশ্বাসকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলো।

সেই সোনার চকমকানিটুকু একগাছি সোনার বালার। যে বালাপরা হাতখানি বিছিন্ন হয়ে পড়েছিলো গজখানেক দূরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা একটি মেয়ের দেহ থেকে। আর? আর সে মেয়ে ফুলি।

দশ বছর পরে দেখা।

কিন্তু হাজার বছর পরে দেখা হ'লেও কি ফুলিকে চিনতে ভুল করতো কানু?

*  *  *  *

হাসপাতালের ঘরে রোগীর খাটের সামনে বসে তাকিয়ে দেখছিলো কানু। দেখছিলো কপালে ব্যাণ্ডেজ থাকা সত্ত্বেও ভুরুর কোণ থেকে গড়িয়ে পড়া একটা জমাট গাঢ় কালচে রক্তের ধারা।

না, তখুনি মারা যায়নি ফুলি, জ্ঞান হয়েছিলো তার। উপযুক্ত চিকিৎসা হ'লে হয়তো বা সামলে যেত। হয়তো 'ফুলি' নামক সেই একটা অদ্ভুত উজ্জ্বল আনন্দ আবার পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো। হয়তো তারপর থেকে পৃথিবীটা অন্যরকম দেখতে হয়ে যেত। কিন্তু তা হ'ল না। সেই এক অখ্যাত গ্রামেই অবহেলিত হাসপাতালের ধুলো ভরা ঘরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল ফুলি। করলো শুধু উপযুক্ত একটু চিকিৎসার অভাবে।

ক্ষতের মুখে রেল-লাইনের ধুলো-কাঁকর ঢুকে সমস্ত রক্ত বিষাক্ত হয়ে গিয়ে জ্বর দেখা দিয়েছিল। প্রবল জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে বিকার। দেড় দিন ধরে ফুলি বিকারের ঝোঁকে কাঁদল, চেঁচাল, অজস্র অর্থহীন কথা বললো, তেড়ে তেড়ে উঠে বসতে চাইল, তারপর' আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল।

নিরুপায় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসে বসে দেখল একটা আধা পাশকরা বোকা ডাক্তার, আর তার তেমনি কম্পাউণ্ডার।

আর কানু?

কান্নুর সেদিনের অবস্থা কান্নু এখন কি আর স্পষ্ট করে মনে আনতে পারে? ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে। 'কান্নু' বলে সেই ছেলেটা পাগলের মতই কাণ্ড করেছিল। চেঁচিয়েছে, ছুটোছুটি করেছে, দেয়ালে মাথা ঠুকেছে, নিজের হাতে নিজের চুল ছিঁড়েছে, আর সেই হতভম্ব কম্পাউণ্ডারটার পায়ে পড়েছে সদর থেকে একটা ইন্‌জেকশনের ওষুধ এনে দেবার জন্যে। যত টাকা লাগে লাগুক, সারাজীবন ধরে ধার শোধ করবে কান্নু। কিন্তু এসব কোন কিছুই কাজে লাগেনি।

কি করে লাগবে?

রেল লাইন উপড়ে ফেলে এ গ্রামের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগা-যোগ নষ্ট করে রেখেছে তো কান্নুরাই। গরুরগাড়ী করে কি আর মৃত্যু-দূতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায়? সে যে ঝড়ের বেগে আসে।

লোকটা গরুরগাড়ী চড়ে গিয়েছিল চেষ্টা করতে, কিন্তু ফিরে আসার আগেই ফুলি মারা গিয়েছিল।

ডাক্তারের মতই স্তব্ধ স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বসে বসে দেখেছিল কান্নু সেই মৃত্যুকে।

অবশ্য নিজে ফুলি বাঁচতে চায়নি। আগে যে দু'দিন চৈতন্য ছিল, তার মধ্যে বলেছিল, "বেঁচে কি হবে কান্নুদা? দেখছ তো ডানহাতটাই কাটা গেছে। কাজের হাত! কাজের হাতটাই যদি গেল তো পৃথিবীর অন্নধ্বংস করে লাভ কি?"

লাভ!

কান্নু ব্যাকুলভাবে বলেছিল, "লাভ তোর নয় ফুলি, আমার! আমার পাপের অন্ততঃ এক টুকরোও প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

শুনে হেসেছিল ফুলি।

হেসে বলেছিল, "বুঝেছি! ভাবছ বাঁচিয়ে তুলে সারাজীবন আমাকে বসিয়ে খাওয়াবে তুমি! কিন্তু একটা নুলো মেয়েকে সারাজীবন বসিয়ে খাইয়ে কি আর প্রায়শ্চিত্ত হবে কান্নুদা? প্রায়শ্চিত্তের আরো অন্য পথ আছে।"

বলেছিল, “হ্যাঁ, পাপ তোমরা করেছ কানুদা, মহাপাপ! ভগবান জানেন কে তোমায় কুমতি দিয়ে এই পাপের পথে টেনে এনেছে। এ পথ ছাড় কানুদা! দেশকে ধ্বংস করার বুদ্ধি ছেড়ে, তাকে গড়বার ব্রত নাও। যদি প্রায়শ্চিত্ত চাও তো বাকী জীবনটা সেই ব্রত নিয়েই থাক। গ্রামে গ্রামে স্কুল খোল, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা কর, গরীব দুঃখী চাষীদের বোঝাও কেমন করে বাঁচতে হয়।”

এত কথা কোথায় শিখেছিল ফুলি?

সেই সামান্য লেখাপড়া জানা ফুল!

সে কথাও জেনেছিল কানু, ফুলিই বলেছিল। মাষ্টারমশাই মারা যাবার পর ফুলি নিতান্ত নিঃসহায় হয়ে চলে এসেছিল কলকাতায় দূর সম্পর্কের এক পিসির বাড়ীতে। সেইখানেই তার শিক্ষা। পিসেমশাই ছিলেন মহাত্মাজীর চেলা, গোড়া অহিংস। নিজের হাতে চরকা কেটে নিজের কাপড় জামার প্রয়োজন মেটাতেন তিনি। পিসিমা পারতেন না বলে বেচারা দুঃখ বোধ করতেন।

ফুলি গিয়ে তাঁর শিষ্য হ'ল।

চরকা কেটে নিজের শাড়ী ফুলিও তৈরি করেছে, তৈরি করে দিয়েছে পিসিমাকে, পিসিমার ছেলেমেয়েদেরকে।

ভারী ভালবাসতেন পিসেমশাই ফুলিকে।

নিজে পরিশ্রম করে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তারপর সঙ্গে করে করে নিয়ে গেছেন তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে। গ্রামে গ্রামে, হাটে, মাঠে, ঘাটে। দুঃস্থ দরিদ্রের সেবা করাই ছিল পিসেমশাইয়ের জীবনের লক্ষ্য।

দু'বছর হ'ল মারা গেছেন পিসেমশাই, কিন্তু ফুলি তার শিক্ষাভ্রষ্ট হয়নি। এই তো এখানেও যে এসেছিল, সে তো এই দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে দূরের গ্রামে মড়ক লেগেছে বলে কলেরার ইন্‌জেকশন দিতে। গাড়ীতে তার আরও সঙ্গী ছিল। ছিল তার পিসতুত ছোটভাই। সেই কথা বলতে গিয়ে উথলে কেঁদে উঠেছিল ফুলি, আর সেই আবেগে কপালের ক্ষতের মুখ থেকে রক্ত ছুটে ব্যাণ্ডেজের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

চীৎকার করে উঠেছিল কানু। ছুটে এসেছিল ডাক্তার, এ রকম দুর্বল রোগীকে কথা বলানোর জন্যে কানুকে তিরস্কার করেছিল। তবুও কথা বলেছিল ফুলি— পরে ডাক্তার চলে গেলে।

বলেছিল, "বুঝতে পারছ তো কানুদা, আপনার লোক শুধু শুধু এরকম বেঘোরে মারা পড়লে প্রাণে কি রকম লাগে? নিজের দিয়েও তো বুঝতে পারছ? এখনো না পারো আমি মরে গেলে নিশ্চয় পারবে- "

"কক্‌খনো তোকে মরতে দেব না।" বলে উঠেছিল বোকা অবুঝ সেই ছেলেটা। কিন্তু তার চাইতে বয়সে ছোট হয়েও কী ধীর স্থির সেই মেয়েটা! চিরকালই ধীর স্থির বুদ্ধিমতী। এই ভয়ঙ্কর অপঘাত মৃত্যুর কবলে পড়েও সে তার স্থিরতা হারায়নি। স্থিরভাবে একটু হেসে বলেছিল, "মরতে দেব না বললেই কি আটকাতে পারবে কানুদা? ঘরে আগুন লাগালে ঘর পুড়বেই। যাক্ আমার মরার জন্যে বলছি না, বলছি আরো পাঁচজনের কথা ভেবে। এই গাড়ী উল্টে কত লোক মারা গেল, কতলোক কাণা, খোঁড়া, বোবা, কালা হয়ে গেল, ভাবো দিকি? কিন্তু সকলেরই তো আপনার লোক আছে? তাদের কষ্টের কথা কখনো ভেবেছ তোমরা?"

শিউরে স্তব্ধ হয়ে গেল কানু।

সত্যিই বটে। তেমন করে কই তো কোন দিন ভাবেনি! বিদেশী সরকারের সম্পত্তি নষ্ট করছি, তার আর্থিক ক্ষতি করছি, আর 'দেশের কাজে' টাকা তুলছি, এই আনন্দটুকু ছিল। তার বাইরে আর কোন চিন্তা করেনি।

ফুলি যেন ওর মন বুঝেই বলল, "কোম্পানী তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে, তাই তোমরা কোম্পানীর ক্ষতি করতে চেয়েছ, কেমন? কিন্তু বল তো কানুদা, এতে আর কোম্পানীর কতটুকু ক্ষতি হবে? না হয় কিছু টাকার লোকসান। অথচ ভেবে দেখ কী ক্ষতি তাদের হয়ে গেল যাদের মা গেল, বাপ গেল, স্বামী গেল, স্ত্রী গেল, গেল

ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, বন্ধু, আত্মীয়! পৃথিবীর সমস্ত টাকা এনে তাদের কাছে ঢেলে দিলেও কি তাদের সে ক্ষতি পূরণ হবে?"

বলতে বলতে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল ফুলি, ভেড়ে বিছানায় উঠে বসল। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "প্রতিজ্ঞা করো কানুদা, আমার সামনে প্রতিজ্ঞা করো আর কখনো এমন কাজ করবে না! বলো দেশের ভাল করতে গিয়ে তার সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে না? বলো বলো—"

বলতে বলতে গড়িয়ে শুয়ে পড়ল ফুলি, শুয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

কানু যখন চীৎকার করে বলতে লাগল "প্রতিজ্ঞা করছি ফুলি, আর কখনো এমন কাজ করবো না, আর কখনো এই ভুল পথে চলবো না", তখন তার এক বর্ণও ফুলির কানে গেল না।

কিন্তু স্বর্গ থেকে কি দেখতে পায় না মানুষ?

ঘর আবছা আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে।

চাকর এসে ঘরে ঢুকলো।

কেষ্ট ইতস্ততঃ করে বলল, "বাবু 'সদরহাট' না কোথা থেকে যেন ভুবন বাবু এসেছে।"

নতুন চাকর, এদের জানাশোনা কাউকেই বিশেষ চেনে না।

সদরহাট!

মিত্তির সাহেব অতীত স্মৃতির অথই সমুদ্র থেকে ভেসে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, "সদরহাট থেকে? নাম বলেছে কিছু?"

"আজ্ঞে না। শুধু বললো 'শিবনাথ সিঁতি ইস্কুল' না কোথা থেকে যেন আসছে।"

'শিবনাথ সিঁতি ইস্কুল'!

মনে মনে একটু হাসলেন মিত্তির সাহেব। এ ব্যাটার এই রকমই উচ্চারণের বাহার! বললেন "বুঝেছি। দেখ বল্‌গে যা—বাবুর আজ

শরীরটা তেমন ভাল নেই, আজ আপনারা বিশ্রাম করুন, খাওয়া দাওয়া করুন, কাল সকালে কথাবার্তা যা হবার হবে।"

"আচ্ছা আজ্ঞে।"

'শিবনাথ স্মৃতি বিদ্যাশ্রম'!

শিবনাথ মাষ্টারের কল্পনার রূপে গড়া। মানুষ যায়, বেঁচে থাকে তার কল্পনা পরিকল্পনা, তার তপস্যা আর সাধনা।

বেঁচে থাকে, যদি তার সাধনার যথার্থ উত্তরাধিকারী কোথাও থাকে।

"আর দাঁড়া শোন—" চাকরটাকে আর একবার থামালেন মিত্তির সাহেব, "তোদের মাকে বলে দিস্ বাবু দু'জন এখানে খাবে।"

"সে আর বলতে হবে না বাবু, দেখুন গে এতক্ষণে বোধহয় চা জলখাবার চলে গেছে।" বলে বেজার মুখে চলে যায় চাকরটা।

মিত্তির সাহেব আর একবার হাসেন।

আবার একটু ক্ষুব্ধও হন। হতভাগা এমন আচমকা এসে ডাকল!

এতক্ষণ যেন অপরের লেখা একখানা উপন্যাস পড়ছিলেন মিত্তির সাহেব। এই আচমকা বাধায় সে কাহিনীর খেই হারিয়ে গেল। জমাট সুরটা আর জমবে না।

এখন খণ্ড খণ্ড করে কিছু মনে পড়তে পারে, স্পষ্ট মনে পড়বে না, কাহিনীর নায়ক 'কানু' বলে সেই ছেলেটা কেমন করে বিপ্লবীদলের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সুরু করলো নতুন জীবনের সাধনা।

তারপর দেশের ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেল, গেল কত দুর্দিন, দুঃসময়। যুদ্ধ এল, মহামারী এল, বন্যা এল, এল রক্ত ক্ষয়ের নেশা। দেশ ভাগ হল, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারল, ভুল পথ আর সত্যপথ একাকার হয়ে দিশেহারা করে তুলল জাতিকে। তবু কানু তা'র সেই একদিনের প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হ'ল না। সেদিন থেকে ভাঙার কাজ ছেড়ে গড়ার কাজকে নিয়েছে জীবনের ব্রত করে। আগে নিজের ভাঙাচোরা জীবনটাকে গড়েছে, তারপর জীবনের লক্ষ্য আর আদর্শকে।

তিলে তিলে ধীরে ধীরে কত প্রতিষ্ঠানই গড়ে তুলল কানু। ছেলেদের স্কুল, মেয়েস্কুল, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, আরো কত কি?

আর তাঁর জীবিকা?

সেও তো গড়ার কাজ।

রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার মিস্ত্রি সাহেবের কত নাম ডাক, কত প্রশংসা!

এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে।

দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কী বিরাট বিরাট কল্পনা, কী বিপুল অর্থব্যয়, কত কারখানা, কত বাঁধ, কত বিদ্যুৎ শক্তির কেন্দ্র, কত বন কেটে নগর তৈরি! এর বহুবিধ কাজের সঙ্গেই যুক্ত আছেন মিস্ত্রি সাহেব। কর্মের তপস্যার পথে এগিয়ে চলেছেন জীবনের পরিণতিতে।

আচ্ছা, সেই দাশু মিস্ত্রি আর নান্টু মিস্ত্রি?

তারা কোথায় গেল?

তারা?

দাশু মিস্ত্রি রোগে ভুগে ভুগে বয়েস না হতেই বুড়ো হয়ে গিয়ে চলে গিয়েছিল কাশীতে রাসমণির কাছে। তা' রাসমণিও তো সেবার মারা গেল, যেবার কাশীতে খুব 'বেরিবেরি' হলো। দাশু মিস্ত্রি এ দোর ও দোর ঘুরে ঘুরে না খেয়ে কঙ্কালসার হয়ে অবশেষে চলে এসেছিল কলকাতায়, এসেছিল নাকি ছেলের সন্ধানে। তা' কোথায় বা ছেলে আর কোথায় বা তা'র সন্ধান! পরে নান্টু মিস্ত্রির মুখেই শোনা —এই রাস্তার আনাচে কানাচেই নাকি কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে দাশু মিস্ত্রি কিন্তু কেউ কাউকে চেনেনি।

শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য মারা গিয়েছিল দেশের ভিটেয় সদরহাটে ফিরে গিয়ে।

আর নান্টু মিস্ত্রি?

সে তো এখন রাজার হালে বাস করছে কানু মিস্তিরের বাড়ীতেই। দুধের সরটি, মাছের মুড়োটি, দইটি, সন্দেশটি, মিঠেপান, অম্বুরী তামাক, এসব না হলে চলে না তাঁর! বাড়ীতে যে কেউ বেড়াতে আসে, তা'র কাছেই গল্প করেন নান্নু মিস্তির—"এসব ছাড়তে পারিনে বাপু, চিরকেলে অভ্যাস! আর ছাড়বোই বা কেন? কানু আমার রাজাছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে, বুড়োকাকাকে কি আর অযত্ন করতে পারে?" অবশ্য কানুর ছেলেদের কাছে জমজমাটি গল্প ফাঁদেন তিনি, "তোদের বাপ যে আজ এমন মান্যগণ্য, এমন একটা মানুষের মত মানুষ হয়েছে, সে কি অমনি অমনি? হয় না বাপু অমনি হয় না। গোড়ার জীবনে সুশিক্ষা চাই! সেই সুশিক্ষাটি কে দিয়েছিল ওকে? এই আমি! বুঝলে ভায়ারা এই নান্নু মিস্তির। ছেলে শিক্ষা দেওয়া কাকে বলে সে কথা এই নান্নু মিস্তির ভাল রকম জানে। আর তোরা? তোরা মানুষ হচ্ছিস যেন এক একটি আদরের দুলাল, এক একটি রাজপুত্তুর। হুঃ! এতে কি আর মানুষ হবি? কচু হবি। এক একটি গোবর গণেশ হবি।"

ছেলেরা রাগ করে না, হাসে।

হাসে আর বলে, "বাবাকে তো আপনি রাজাই বলেন ছোটদাদু, তবে আমরা রাজপুত্তুর হবো না কেন?"

নান্নু মিস্তির বলেন, "তর্ক কোরনা বাপু, তর্ক কোরনা! তর্ক আমার সয় না" বলেই রাগের মাথায় যা তাঁর সয় তাই করে ফেলেন। টপাটপ গোটা চারেক কড়াপাকের সন্দেশ খেয়ে ফেলেন। ঘরে সর্বদা মজুত থাকে কি না। রাখতেই হয় মজুত, নইলে নাকি ওঁর পিত্তি পড়ে।

ঘরে আলো জ্বালা হয়নি।

বারান্দার আলোয় দরজার কাছে দুটো ছোট ছোট ছায়া পড়লো।

"কে? কে ওখানে?"

জিজ্ঞাসা করেন মিস্তির সাহেব।

"আমরা বাবা !" আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ছায়া দুটি। ছোটছেলে আর মেয়ে। একটি মাত্রই মেয়ে।

"তোমাদের এখুনি বেড়িয়ে ফেরা হয়ে গেল ?"

"বেড়িয়ে ? না তো ! আমরা তো আজ খেলতে যাইনি।"

"খেলতে যাওনি ? কেন ?"

"বাঃ আজ কী ঝড় হলো !"

"ওঃ তাও বটে ! ঝড় হলে তোমরা আর বাড়ী থেকে বেরোও না, তাই না ?"

মেয়েটা হেসে উঠল. "আহা ঝড় হলে বুঝি বেরোন যায় ?"

"যায় না ! তা বটে ! আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু যেত ! ঝড়ের মুখে বেরিয়ে পড়াই তো মজা !"

"বাঃর বেশ তো ! মা তা'হলে আমাদের আস্ত রাখবে বুঝি ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তাও তো সত্যি, তোমার মা যে আবার সহরের মেয়ে।"

ছোট ছেলেটা আরো এগিয়ে আসে, "একদিন আমরা ঝড় হলে রাস্তায় বেরোব বাবা !"

"রাস্তায় ?" মিত্তির সাহেব হেসে ওঠেন, "শুধু ঝড়ে রাস্তায় বেরিয়ে কি করবি ? আম কুড়োবার জন্যেই তো যাওয়া ! এখানে আম কোথা ?"

"তা'হলে আমরা একদিন ঝড় হ'লে তোমার সেই দেশের বাড়ীতে যাব বাবা !" - ছেলেটা বলে বাবার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। মিত্তির সাহেব সস্নেহে তার মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, "শুধু আমার দেশ নয় বাবা, তোমাদেরও দেশ ! যাব যাব নিয়ে যাব। দেশের বাড়ীটা আগে তৈরি হোক।"

ছেলেমেয়েরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে, "তোমার কি মাথা ধরেছে বাবা ?"

"কই না তো ! কেন ?"

"তবে যে অন্ধকারে রয়েছ ?"

"ওঃ তাই? না মাথা ধরেনি, এমনি। তোমাদের ভাল লাগছে না বুঝি? আচ্ছা যাও এবার তোমাদের ঘরে যাও, খেলা করগে।"

"খেলা? ওরে বাবা!" মেয়েটা ভয়ের ভান করে, "সন্ধ্যেবেলা খেললে মা তো একেবারে বকে রসাতল! এখন শুধু পড়া আর পড়া।"

মিত্তির সাহেব মৃদু হেসে বললেন, "তোদের মা তোদের খুব বকে, না রে?"

মেয়েটা গিন্নীর মত ভারীক্কি চালে বলে, "আহা তা' বকলেই বা? মা হয়েছেন একটু বকবেন না? আমাদের তো মা ভালবাসেন খু—বই, শুধু একটু রাগী বলেই তাই—"

মেয়েটা চলে যেতেই হঠাৎ কেমন অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন মিত্তির সাহেব। কী অদ্ভুত সুন্দর কথাটা বলে গেল অতটুকু মেয়েটা! কই এ রকম কথা তো তিনি কোনদিন ভাবেননি ছেলেবেলায়!

যখন সেই রোগা দড়ির মত মানুষটা অন্য কারো সঙ্গে ঝগড়া করে তিত-বিরক্ত হয়ে নিজের ছেলেকে বকুনি লাগাতো, তখন তো কই সে ছেলেটার একবারের জন্যেও মনে হ'তো না 'আহা তা বকলেই বা, মা হয়েছেন, একটু বকবেন না?' কোনদিনই মনে হয়নি হয়তো তা'র মা তাকে ভালবাসে, শুধু নিজেই সে উৎপীড়িত লাঞ্ছিত বলেই সমস্ত ঝালটা ঝাড়ে ছেলের ওপর! আর সেই মানুষটা? সেই পিসি? সেও কি তা'হলে ভালবাসতো তার ভাইপোটাকে? ওরকম গালমন্দ করতো একটু রাগী বলেই?

হায়! হায়! একথা তো একদিনের জন্যেও কখনো মনে হয়নি সেই ছেলেটার! যে ছেলেটা তার সারা ছেলেবেলাটা উৎকট এক দুরন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছে তাকে কেউ ভালবাসে না ভেবে!

ছেলেটা কি তবে ভয়ঙ্কর একটা নির্ব্বোধ ছিল? তার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাই আজীবন তাকে স্বস্তি দেয়নি, শান্তি দেয়নি?

আর এই মেয়েটা, ছোট্ট এই মেয়েটা—এমন স্বচ্ছ বুদ্ধি পেলো

কোথায়? কেমন করে বুঝল মা বাপ যদি তিরস্কার করে, তাতে তাদের ভালবাসায় সন্দেহ করতে নেই!

না, আশ্চর্য্যেরই বা কি আছে?

মেয়েরা তো এমনিই স্থির শান্ত বুদ্ধি হয়। 'ফুলি' বলে সেই ছোট্ট মেয়েটাও তো ঠিক এই কথাই বলত! সোনার প্রদীপের মত উজ্জ্বল তার সেই মুখটা মনে পড়ল, যে মুখটা উঁচু করে বলত, "কী যে বল কাকুদা, 'মা' বলে কথা! না ভালবাসেন না—এও কি হয়?"

সেই সোনার প্রদীপের স্থির শিখাই মিহির সাহেবের বিপর্য্যস্ত জীবনকে পথ দেখিয়েছে।

"এ কি? এখনো ঘর এমন অন্ধকার যে?···হরিসাধন! সন্ধ্যেবেলা ঘরের আলোটা একটু জ্বেলে দিতে পারিসনি?" চাকরের উদ্দেশে একটা ধমক দিয়ে সুইচটা টিপেই মিসেস মিত্তির একটু থতমত খেয়ে গেলেন, "আরে তুমি শুয়ে আছ অন্ধকারে? কেন? শরীর ভাল নেই?"

মিত্তির সাহেব ক্লান্ত গলায় বলেন, "শরীর ভালই আছে, আলোটা কেমন ভাল লাগছে না সুধা, নেভানোই থাক।"

মিসেস মিত্তির, দেখা যাচ্ছে—যাঁর নাম সুধা, তিনি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারেই একটা সোফায় বসে পড়ে বলেন, "তুমি এখনও বাড়ী আছ তা' কি জানি? স্কুলের সেই ভদ্রলোক দু'টি তো থাকতে চাইল না কিছুতে, বললো কোথায় তাদের আত্মীয়ের বাড়ী আছে সেখানে থাকবে, কাল সকালে আসবে আবার।"

"আচ্ছা!"

"আর শোন, তুলসীপুর থেকে সেই বুড়ো ডাক্তারটি একটা চিঠি দিয়েছেন—"

"চিঠি?"

"হ্যাঁ, পোষ্টকার্ডের চিঠি, পড়েই ফেলেছি। নতুন কিছু নয়, তুলসীপুর হাসপাতালের যে বিল্ডিংটা তুমি করে দিয়েছ তার নামটা তো এখনও সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়নি, তাই উদ্বোধন করতে পারছেন না। সঠিক একটা নাম যদি—"

"আচ্ছা আজই জানাবো।"

"ঠিক করেছ নাকি ?"

"এইমাত্র করলাম।"

"কী ?" সুধা একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, "ফুলেশ্বরী দাতব্য চিকিৎসালয় ?"

"না !" মিত্তির সাহেব স্থিরস্বরে বলেন, "কমলা সেবাভবন !"

কমলা সেবাভবন !

অবাক হয়ে যায় সুধা, বলে, "কমলা সেবাভবন ?" সুধা জানেনা 'কমলা' কার নাম।

মিত্তির সাহেব জোর দিয়ে বলেন, "হ্যাঁ ! হ্যাঁ ওই নামই থাকবে। আজই লিখে দেব।"

সুধা জানেনা, কিন্তু মিত্তির সাহেব তো ভুলে যাননি সেই রোগা দড়ির মত মানুষটার ওই নামই। [illegible]

---


MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE LIBRARY. Agartala.